লঙ্কেশ্বর
কবিশেখর কালিদাস রায়
'দেশী কোত্তম'

লঙ্কেশ্বর

কবিশেখর কালিদাস রায়, 'দেশিকোত্তম'

সঞ্জীব প্রকাশন
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
সঞ্জীব ভট্টশালী, বি. কম,
১০৭ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

নূতন সংস্করণ—১৯৮৯

মূল্য : আট টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
কালিকা প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
২৫, ডি. এল. রায় স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

পুলস্ত্য-বিশ্রবা-কুবের

ব্রহ্মার পুলস্ত্য নামে এক পুত্র ছিল। ইনি সকল বিষয়ে প্রায় ব্রহ্মারই মত ছিলেন, দেবতারা সকলেই ইঁহাকে পিতার মত সম্মান ও ভক্তি করিতেন। ইহার মত উগ্র তপস্বী দেবতাগণের মধ্যে কেহ ছিলেন না। কিন্তু এমনি দৈবের নির্বন্ধ—এমন যে দেবর্ষি পুলস্ত্য—তাঁহা হইতেই এক নতুন রাক্ষস বংশের সৃষ্টি হইল। তাঁহার বংশে এমন সব সন্তান জন্ম হইল – যাহাদের হাতে দেবগণের দূর্গতির অবধি থাকিল না। এই রাক্ষসরা দেবতাগণের থেকে কোন অংশে কম ছিলেন না। কেবল ধর্মাধর্মের ধার ধারিত না বলিয়া তাহারা দেবতাদের মত মানুষের পূজ্য হইয়া উঠে নাই। দেবতাদের সঙ্গে রাক্ষসদের বিবাদটা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে বিবাদের মতই। কিরূপে দেবর্ষি হইতে দেবতার জ্ঞাতিবৈরী রাক্ষস সৃষ্টি হইল, সেই কথা প্রথমে বলা যাক।

সুমেরু পর্বতে রাজর্ষি তৃণ-বিন্দুর আশ্রম ছিল। পুলস্ত্য সেই আশ্রমে তপস্যা করিতে আসিলেন। পুলস্ত্য যখন তৃণ বিন্দুর আশ্রমে

তপস্থায় বসিলেন, তখন তাহার অভিশাপের ভয়ে আশ্রমের ত্রিসীমানা হইতে নরনারী, দেবদেবী, অপ্সরকিন্নর, পশুপক্ষী যে যেখানে ছিল—সকলেই দিগ্বিদিকে পালাইল। কেবল তৃণ-বিন্দুর অবিবাহিতা কন্যা সাহস করিয়া ঋষির নিকটে যাতায়াত করিয়া পরিচর্যা করিত। তৃণবিন্দুর কন্যার সেবা শুশ্রূষায় তুষ্ট হইয়া ঋষি তাহাকে সহধর্মিনীরূপে গ্রহণ করিলেন। এই পত্নীর গর্ভে ঋষি বিশ্রবা নামে এক ক্ষণ জন্মা পুত্রের জন্ম হইল। বিশ্রবা কালক্রমে মহাপণ্ডিত, তেজস্বী, বেদজ্ঞ ও পিতার মতই উগ্র তপস্বী হইয়া উঠিলেন। বিশ্রবার বিদ্যা, জ্ঞান, তপস্যা ও মহত্বের খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যে তপোবনে রটিয়া গেল। মহর্ষি ভরদ্বাজ এই সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন। এই কন্যার নাম দেব বর্ণিনী। দেব বর্ণিনীর গর্ভে বিশ্রবার এক পুত্র হইল।

যৌবনকাল উপস্থিত হইবামাত্র এই পুত্র গভীর বনে প্রবেশ করিয়া দারুণ তপস্যা আরম্ভ করিল। এক হাজার বৎসর উগ্র তপস্যার পর একদিন চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—দেবতারা সকলে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত।

দেবতারা বলিলেন—'বৎস, বর চেয়ে লও। তোমার তপস্যায় আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি।'

তপস্বী বলিলেন—"যদি আমাকে দয়া করে বর দেন—তবে আমাকে দিকপাল করে দিন। আর দেবতাদের ধনসম্পদের ভাণ্ডারী করুন।"

ব্রহ্মা বলিলেন—"তথাস্তু, এটা আর বেশী কথা কি? তাছাড়া তোমাকে তোমার কার্যের সাহায্যের পুষ্পক রথ দিলাম। আদেশ করলেই এই রথ তোমাকে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল—যেখানে তোমার ইচ্ছা—সেখানেই নিয়ে যাবে। এই রথ কামগতি, এর অগম্য স্থান নেই।"

এই তপস্বী—যক্ষগণের অধিপতি কুবের। কুবের পিতার আশ্রমে

ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে বলিলেন—"পিত, আমি দেবতার বরে উত্তর দিকের দিকপাল হয়েছি—দেবতাদের ধন-ভাণ্ডারের কর্তাও হয়েছি—আকাশগামী জীবন্ত রথও পেয়েছি—কিন্তু আমি থাকব কোথায় ? আমার একটা বাসভূমির ব্যবস্থা করুন।"

বিশ্রবা বলিলেন—"দেখ, দক্ষিণ সমুদ্রে ত্রিকূট নামে একটি পর্বত আছে। সেই পর্বতের উপর বিশ্বকর্মা লঙ্কা নামে একটি সোনার পুরী নির্মাণ করে রেখেছেন। লঙ্কাকে দ্বিতীয় অমরাবতী বললেই হয়। এটা তৈরী হয়েছিল রাক্ষসদের জন্য। রাক্ষসরা বিষ্ণুর ভয়ে ঐ পুরী ত্যাগ করে পাতালে আশ্রয় নিয়েছে, এখন ঐ পুরী শূন্য পড়ে রয়েছে। তুমি যক্ষদের নিয়ে সেখানে গিয়ে রাজত্ব করতে পার।"

পিতার নির্দেশ পাইয়া কূবের লঙ্কাপুরী অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু প্রজা তো চাই। তখন তিনি অভয় ও আশ্বাস দিয়া পাতাল হইতে রাক্ষসদিগকে আনাইলেন। রাক্ষসগণ কূবেরের অধীনে সুশাসনে শান্তশিষ্ট ও ভদ্র হইয়া উঠিল। তাহারা অন্যায়, অধর্ম, অত্যাচার ইত্যাদি সব ভুলিয়া গেল। রাক্ষসগণ ধর্মশীল কুবেরের আশ্রমে নিরীহ ও ধর্মশীল হইয়াছে দেখিয়া দেবতারা আর কোন আপত্তি করিলেন না। লঙ্কা অল্পদিনের মধ্যে ধনধান্যে ফল-পুষ্পে শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিল। যক্ষ ও রক্ষঃ একই শ্রেণীর জীব। সম্ভবতঃ যে সকল রাক্ষস শান্ত ও ধর্মশীল তাহাদিগকে যক্ষ বলা হইত।

রাক্ষসগণের নেতা সুমালী কিন্তু সাহস করিয়া পাতাল ছাড়িয়া মর্ত্ত্যলোকে আসিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহারই মর্ত্ত্যে আসার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তাহার কন্যা কৈকসী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে—তাহার জন্য সুপাত্র সন্ধান করিতে হইবে। সুমালী দেবতা-দিগকে বড়ই জ্বালাতন করিয়াছিল—স্বয়ং বিষ্ণুকেই বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া তাহাকে লঙ্কা হইতে তাড়াইতে হইয়াছিল। সুমালীর সেজন্য মর্ত্ত্যে আসিবার সাহস নাই।

অনেক ভাবিয়া শেষে সুমালী কন্যাকে বলিল—"বৎসে, তুমি তো আর বালিকাটি নও। তুমি নিজেই মর্ত্যে গিয়ে পাত্র সন্ধান করে লও।"

পিতার আদেশ পাইয়া কৈকসী একেবারে বিশ্রবা মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঋষিকে আপন মনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবার সাহস হইল না—মাথা হেঁট করিয়া কৈকসী ঋষির সম্মুখে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিশ্রবা তখন একটা খুব বিরাট ধরনের যজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত। ধ্যানবলে কৈকসীর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঋষি একেবারে অগ্নিশর্মা। তিনি বলিলেন—"বুঝেছি রাক্ষসী, তুই কি জন্য এসেছিস। কিন্তু তুই অতি অসময়ে এসে আমাকে বিরক্ত করলি। অতএব তোর গর্ভে দারুণাকার ভীষণ ভীষণ রাক্ষস জন্মাবে। এই অভিশাপ দিলাম।

কৈকসী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'সেকি প্রভু? আপনার মত রাক্ষসবাদী অংশে দুরাকার পুত্র হবে—এ কেমন কথা? আপনি প্রসন্ন হোন, আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আপনার পায়ে পড়ি।"

ঋষি বলিলেন—"আমি যা বলেছি, তা ফেরাবার নয়। তবে তোর গর্ভে সব শেষে যে পুত্র হবে, সে আমার বংশের উপযুক্ত ত্রিলোক পূজ্য পরম ধার্মিক মহাপুরুষ হবে।"

জন্ম ও তপস্যা

কৈকসী যথাসময়ে এক ভীষণ রাক্ষস প্রসব করিল। তাহার দশটি মাথা, বিশখানি হাত, কালো মেঘের মত তাহার গায়ের রঙ! এই পুত্র জন্মিবামাত্র সূর্য নিষ্প্রভ হইল, মেঘে রক্ত বৃষ্টি আরম্ভ হইল, ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল, সমুদ্র উছলিয়া উঠিল, ভীষণ ভূমিকম্প হইতে লাগিল, চারিদিকে অনেকপ্রকার অশুভ চিহ্ন দেখা দিল। এই পুত্রের দশটি গ্রীবা দেখিয়া বিশ্রবা তাহার নাম রাখিলেন দশগ্রীব।

দশগ্রীবার পর জন্মিল কুম্ভকর্ণ। ইহার দেহটা অত্যন্ত বিশাল একটি জীবন্ত পর্বত বলিলেই হয়। তারপর জন্মিল বিকট আকারের

একটি কন্যা। ইহার নখগুলি এত বিশ্রী ও অস্বাভাবিক যে, ইহার নাম হইল সুর্পনখা।

সবশেষে জন্মিল—বিভীষণ। বিভীষণের জন্ম হইবামাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল—স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি শোনা গেল। নামটি বিভীষণ হইল কেন—ইনিই হইলেন বংশের 'বিভূষণ'।

ঋষির অভিশাপের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই—রাক্ষসের দৌহিত্র যে রাক্ষস হইবে, তাহার বৈচিত্র্য কিছু নাই। কিন্তু ঋষি অংশে যখন জন্ম, তখন রাক্ষস না হইতেও পারিত। তাহা ছাড়া, কৈকসীর নিজের দেহে রাক্ষসীর কোন লক্ষণ ত ছিল না। এক বিভীষণেই ঋষি অংশ প্রবল হইল। দশগ্রীব ও কুম্ভকর্ণ আকারে রাক্ষস হইলেও ঋষির প্রধান শক্তিটি সম্পূর্ণ লাভ করিল—অর্থাৎ যৌবনে পিতার মত উগ্র তপস্বী হইয়া উঠিল।

কিন্তু বিভীষণের মত স্বভাবতই ইহারা তপস্বী হয়ে উঠে নাই। প্রথম জীবনে রাক্ষসের স্বভাবটাই ছিল প্রবল,—আশ্রমে আশ্রমে ঋষিদের উপর অত্যাচার করিয়াই বেড়াইত। একদিন কুবের পিতার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আশ্রমে আসিলে কৈকসী কুবেরকে দেখিয়া বলিলেন,—

—"দেখ দেখি, দশগ্রীব, কুম্ভকর্ণ, তোমাদের বড় ভাই কেমন তেজস্বী, ক্ষমতাশীল, ধর্মশীল মহাপুরুষ। আর তোমরা কিন বনের

হিংস্র পশুর মত। ছিঃ, কি লজ্জার কথা! তোমরা চেষ্টা করে কি বড় ভাই-এর মত হতে পার না?

মায়ের মুখে ধিক্কার শুনিয়া দশগ্রীবের চৈতন্য হইল। দশগ্রীব তখন ঈর্ষায় ও ক্রোধে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল—'আমিও তপস্যা করিয়া দাদার সমান—সমান কেন, দাদার চেয়ে বড় হব। আমি এখনি তপস্যায় চললাম। তুমি দেখো মা, আমি ত্রিলোক বিজয়ী হব।'

দশগ্রীব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তপস্যার জন্য যাত্রা করিল, অনুগত কুম্ভকর্ণও অনুগমন করিল। বিভীষণ ছিলেন পিতার অনুগত পুত্র স্বভাবতই ধর্মশীল। তিনি পিতা ও পিতামহের মত কৈশোর কাল থেকে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। দশগ্রীব এমন নিদারুণ তপস্যা করিতে লাগিল যে, দেবতারা অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। এমন তপস্যা কোন দেবতা কোনদিন করেন নাই। এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইবামাত্র দশগ্রীব একটি মাথা কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দিল। এইরূপ নয় হাজার বৎসর নয়টি মাথা আহুতি দেওয়ার পর, যেমন দশহাজার বৎরের শেষে বাকী মাথাটিও কাটিতে যাইবে—অমনই ব্রহ্মা স্বয়ং বরদানের জন্য তাহার সম্মুখে অবতীর্ণ হইলেন।

ব্রহ্মা দশগ্রীবের হাতের খড়গ কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—'বৎস! তোমার তপস্যা নিদারুণ—তুমি এই মাথাটি আর কেটে ফেল না। তোমার মত তপস্য—দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ বা গন্ধর্বের মধ্যে কেউ কখনো করেনি—তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি, অভিষ্ট বর চেয়ে লও।'

দশগ্রীব বলিল—'প্রভু! আমাকে অমরত্ব দাও, আর কিছুই চাই না।"

ব্রহ্মা বলিল—'বাছা, তোমাকে অমরত্ব বর ত দিতে পারব না। অন্য যে কোন বর চাও।'

দশগ্রীব বলিল—'তবে প্রভু আমাকে এই বর দাও, যেন দেব,

দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, সর্প ও পক্ষী হতে আমার মরণ না হয়। এছাড়া অন্যান্য জীবকে আমি ভয় করি না। মানুষকে আমি গ্রাহ্যই করি না।'

ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'বেশ,—এ বর তোমাকে এক্ষণি দিচ্ছি। এ বর ছাড়া আরও দুটি বর তোমাকে বাড়তি দিচ্ছি। অমরত্ব বর দিতে না পেরে বড় লজ্জিত হয়েছি, এতে তার ক্ষতিপূরণ হবে।'

'তুমি তপস্যাকালে যে নয়টি মাথা যজ্ঞে আহুতি দিয়েছ, সেগুলি সব তুমি ফেরৎ পাবে, আর তুমি কামরূপ হবে, অর্থাৎ যে কোন মূর্তি, যে কোনরূপ ধারণ করতে পারবে।'

এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। দশাননের নয়টি মাথা আবার স্বস্ব স্থানে জাগিয়া উঠিল। দশানন তখন দেখিল, ব্রহ্মাকে ঠকাইয়া সে প্রকরান্তরে অমর হইয়াছে। উপরন্ত আরো দুটি দুর্লভ বর পাইয়াছে।

ব্রহ্মা বিভীষণের নিকট গিয়া বর দিতে চাহিলেন।

বিভীষণ বলিলেন—'দেব, আপনি যদি তুষ্ট হয়ে থাকেন—তবে আমাকে এই বর দিন, যেন সঙ্কটকালেও আমার ধর্মে মতি থাকে, গুরুর কাছে দীক্ষা না নিয়েও আমার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, আর সময়ে আমার বুদ্ধি যেন ন্যায় পথে অনুসরণ করে। এর বেশী আমি কিছুই চাই না।'

ব্রহ্মা পরম তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'বাছা তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। আমি তুষ্ট হয়ে তোমাকে একটি অযাচিত বর দিচ্ছি। তুমি অমর হও। এই অমরত্ব-বর তোমার ভ্রাতা দশানন চেয়েছিল, তাকে আমি এ বর দিতে পারি নাই। না চাইতেও অক্লেশে তোমাকে দিলাম। বিশ্বের কল্যাণও আমাকে দেখতে হবে, কেবল উগ্র তপস্যার তাপে গলে গেলেইত চলবে না। তুমি অমর হলে বিশ্বের মঙ্গল হবে—দশানন অমর হলে যে সৃষ্টি নাশ পাবে।'

ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর দান করিবার জন্য যাইতেছিলেন, দেবরাজ তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া চরণে পতিত হইয়া নিবেদন করিলেন—'প্রভু, আপনি কোথায় চলেছেন? আপনি কি আমাদের সর্বনাশ করিবেন? বিনা বরেই কুম্ভকর্ণ দেবগণকে উদ্বাস্ত করে তুলেছে, বর পেলেত আর রক্ষা নাই। ওকে কিছু বর দেবেন না,—ওকে যদি বর দেন, তবে আগে ওর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাতে হবে। নইলে রক্ষা নেই, পিতামহ। একা দশাননই আপনার বরে আমাদের পাতালে পাঠাবে, তার উপর কুম্ভকর্ণকে বর দিলে ত্রিলোকে দেবতাদের নামও থাকবে না।

ব্রহ্মা একটু ভাবিলেন, তারপর সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কুম্ভকর্ণের বুদ্ধিভ্রংশের জন্য আদেশ করিলেন। সরস্বতী কুম্ভকর্ণের অন্তরে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইলে ব্রহ্মা বর দেওয়ার জন্য উপস্থিত হইলেন। বর দিতে চাহিলে কুম্ভকর্ণ বিকৃত বুদ্ধিতে বর চাহিয়া বসিল—

"আমি যেন চিরকাল ঘুমে বিঘোর হয়ে থাকি।"

ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

লঙ্কাধিকার

দশানন বর পাইয়া পিতার তপোবেন ফিরিয়া আসিল। দশাননের বরের বার্ত্তা পাতালে পিতামহ সুমালীর কানে পৌছাল তখন সুমালীরা তিন ভাই, মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ ও মহোদর এই চারিজন মন্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া দশাননের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুমালী বলিল—"বৎস, তুমি ব্রহ্মার বরলাভ করেছ শুনে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বহুকাল পরে পৃথিবীতে ফিরে এলাম। এখন তুমি যত সত্বর পার—লঙ্কাপুরীটি উদ্ধার কর। উহা তোমার মাতৃকুলের রাজ্য। উহা তোমার প্রাপ্য। কুবের তোমার ভ্রাতা সন্দেহ নাই,—কিন্তু তাঁর ত পুরীতে অধিকার নেই। ন্যয়তঃ তোমারই ও রাজ্য অধিকার করার

কথা। তুমি লঙ্কা অধিকার করলে আমরা সমস্ত রাক্ষসকুল নির্ভয়ে তোমার পুরীতে এসে বাস করতে পারব। তুমিই রাক্ষসকুলের সর্বে-সর্বা কর্তা হলে।"

ইহার উত্তরে দশানন যাহা বলিল—তাহা কিন্তু ঋষি পুত্রের উপযুক্ত কথা। দশানন বলিল—

"কুবের আমার বড় ভাই, তিনি একজন মহাপুরুষ। তাঁকে রাজ্য হতে দূর করা কখনও সঙ্গত নয়। আমি বাহুবলে নূতন রাজ্য জয় করব কিংবা গড়ে তুলব—আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।"

কিন্তু সুমালী ছাড়িবার পাত্র নয়। নূতন রাজ্যের প্রতি সুমালীর লোভ নাই। লঙ্কা—তাহার নিজের রাজ্য ছিল। সেই রাজ্য হইতে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছে। সে অপমান সে ভুলিতে পারে নাই। তাই সুমালী আপন রাজ্যরই পুনরুদ্ধার চায়। সুমালী তখন প্রহস্তকে বলিল—"তুমি দশাননকে যেমন করে পার রাজী কর।"

প্রহস্ত তখন দশাননের কাছে অনেক পৌরানিক উপাখ্যান বিবৃত করিতে লাগিল—এবং তদ্বারা প্রমান করিতে লাগিল যে, প্রয়োজন হলে ভ্রাতার সহিতও শত্রুতা করা চলে এবং এরকমের শত্রুতা দেবতারা প্রায় করিয়া থাকেন। রাজ্যে কুবেরের অধিকার নাই,—রাজ্য তাহারই প্রাপ্য।
আপন রাজ্য অধিকার করিতে গিয়া যদি ভ্রাতৃবধ করিতে হয়, তাহাতে কোন দোষ হয় না ইত্যাদি।

অনেক বাত বিতণ্ডার পর দশানন লঙ্কাপুরী অধিকার করিতে সম্মত হইল। কিন্তু বলিল—"অযথা যুদ্ধ করব না বা দাদাকে পীড়ন করব না। তুমি গিয়ে তাঁকে আমার অভিপ্রায় জানাও, তাতে যদি তিনি রাজী না হন, তখন যা হয় করা যাবে"।

প্রহস্ত লঙ্কায় গিয়া দশাননের অভিপ্রায় কুবেরকে জানাইবা মাত্র কুবের বলিলেন—

"এ অতি উত্তম প্রস্তাব। দশানন তপস্যা করে বর লাভ করেছে—পরাক্রমশালী হয়েছে—তার একটা রাজ্যত চাই-ই। এই লঙ্কা তার উপযুক্ত রাজ্য এ রাজ্য পূর্বে রাক্ষসদের ছিল। দশানন তাদের দৌহিত্র এবং আমার স্নেহের ভাই। সে এ রাজ্য চেয়েছে শুনে খুশি হয়েছি। এ রাজ্য যখন আমি পাই, তখন এর কোন সমৃদ্ধি ছিল না। আমি বহু চেষ্টায় একে ধনে ধান্যে পূর্ণ করেছি। এখন এ লঙ্কা স্বর্ণলঙ্কা। দশানন এ রাজ্য ভোগ করুক। তাকে বলো—সে সত্বরই লঙ্কায় আসুক—আমি আজই অন্যত্র যাচ্ছি।

অতি সহজেই কার্য নিষ্পত্তি হইয়া গেল দেখিয়া দশানন হৃষ্ট হইল। কুবের লঙ্কা ত্যাগ করিয়া পিতার নিকট আসিয়া বলিল—"তাত, আমি লঙ্কাপুরী দশাননকে ছেড়ে দিয়ে এলাম। এখন আমি কোথায় বাস করব বলুন।"

পিতা শুনিয়া বড়ই মর্মাহত হইলেন। বলিলেন—"বৎস, দুরাত্মার সঙ্গে বিবাদ না করে ভালই করেছ। তুমি কৈলাস পর্বতে নতুন রাজ্য স্থাপন কর গিয়ে। আমি আশীর্বাদ করছি—তোমার মঙ্গল হবে। তোমার নতুন রাজ্য ঐশ্বর্যে স্বর্ণলঙ্কাকেও পরাজিত করবে।"

কুবের কৈলাস পর্বতে মহাদেবের আশ্রয়ে নতুন রাজ স্থাপন করিলেন। ক্রমে দেবাদিবের সহিত কুবেরের যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মিল। এদিকে দশানন সমস্ত রাক্ষসকুলকে লইয়া লঙ্কা অধিকার করিল।

দশানন লঙ্কাপুরী অধিকার করিয়া প্রথমে ভগিনী সূর্পনখার বিবাহ দিল, দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত। নিজে বিবাহ করিল ময়দানবের অপূর্ব লাবণ্যবতী কন্যা মন্দোদরীকে। এই বিবাহে সে একটি অমোঘ শক্তিশেল যৌতুক পাইল। কুম্ভকর্ণের বিবাহ দিল, বৈরোচন দৈত্যের কন্যা বজ্রজ্বালার সহিত আর বিভীষণের বিবাহ দিল গন্ধর্বরাজ শৈলুসের কন্যা নিষ্ঠাবতী সরমার সঙ্গে।

মন্দোদরীর গর্ভে দশাননের এক পুত্র হইল। সেই পুত্র জন্মিয়াই মেঘের মত গর্জন করিয়া উঠিল। সেই জন্য তাহার নাম হইল—মেঘনাদ।

বিবাহের পরে কিছুকাল কুম্ভকর্ণ গভীর নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়িল। বর দেওয়ার ছলে যে দেবতারা কুম্ভকর্ণকে ঠকাইয়া গিয়াছে —একথা যখনই দশাননের মনে পড়িত, তখনই প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা বলবতী হইত। কুম্ভকর্ণ যখন সত্য সত্য ঘুমাইয়া পড়িল—শত চেষ্টাতেও তাহাকে জাগাইয়া রাখা গেল না—তখন দশাননের ক্রোধ সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। সে তখন সমস্ত শক্তি দেবতাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিল, একদিনও দেবতাদিগদের শান্তি দিল না, তাহাদের বড় সাধের নন্দনকানন ছারখার করিয়া ফেলিল। ঋষিরা দেবতাদের অনুগৃহীত—সেজন্য ঋষিদেরও দারুণ বিপদ ঘটিল—তাহাদের যাগযজ্ঞ, তপজপ সবই নষ্ট হইতে লাগিল—অপ্সর, কিন্নর, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, যক্ষ, ইত্যাদি যাহারা দেবতাদের অনুগত, তাহারাও দশাননের অত্যাচারে 'ত্রাহি ত্রাহি' রব ছাড়িতে লাগিল।

দেবতাগণ তখন কুবেরের শরণাপন্ন হইলেন। কুবেরকে তাঁহারা বলিলেন—"যক্ষরাজ, আপনার ভাই-এর অত্যাচারে তো আর আমরা তিষ্ঠিতে পারি না—ত্রিভুবন রসাতলে যেতে বসেছে। আপনি তার বড় ভাই, আপনি তাকে বুঝিয়ে বললে তবে যদি তার সুমতি হয়। আপনি বিনা বাক্যে তাকে লঙ্কা ছেড়ে দিয়ে ভালো করেন নি। রাজ্য পেয়ে অবধি তার অত্যাচার দারুণ হয়ে উঠেছে। আপনি যখন চাহিবা মাত্র রাজ্য তাকে ছেড়ে দিয়েছেন—তখন সম্ভবতঃ সে আপনার সদাশয়তার মর্য্যাদা রক্ষা করবে—আপনার কথা অবশ্যই শুনবে।"

কুবের বলিলেন—"দেবগণ, দশানন আমার কথা শুনবে বলেত মনে হয় না। সে আমাদের ত্রিলোক পূজ্য পিতার কথাই শোনে না, ব্রহ্মার মত শক্তিশালী তেজস্বী পিতামহের কথাও শোনে না—আর আপনারা প্রত্যাশা করেন সে আমার কথা শুনবে? সে ভাবে, আমি তাকে রাজ্য ছেড়ে দিয়েছি ভয়ে—স্নেহে নয়। যাইহোক বড় ভাই-এর কর্তব্য যা তা আমি করি—না শোনে, না শুনবে, আমি কেন ধর্মভ্রষ্ট হই?"

কুবের দেবতাদের কথা মত দশাননের কাছে দূত পাঠাইলেন। দশাননের বিরাট মূর্তি ও রাজসভার আড়ম্বর দেখিয়া দূতের মূর্চ্ছা হইল। সংজ্ঞা লাভের পর দূত বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়া নিবেদন করিল—"মহামান্য লঙ্কেশ্বর, আপনার ভ্রাতা আপনাকে বলে পাঠিয়েছেন—কুম্ভকর্ণের প্রতি অবিচারের যথেষ্ট প্রতিশোধ লওয়া হয়েছে—এইবার ক্ষান্ত হোন—ত্রিভুবন আপনার ভয়ে কম্পমান। আপনার ভ্রাতা দেবাদিদেব মহাদেবের পরম বন্ধু, তিনি আপনার ব্যবহারের জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ লজ্জিত। দেবগণ আপনার অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য আয়োজন করেছেন। এখন সতর্ক হওয়াই উচিত।"

দূতের অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল—ভয়ে সব কথা সে গুছাইয়া বলিতে পারিল না। এই কয়টি কথা বলিয়াই সে কাঁপিতে কাঁপিতে পুনরায় মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

দূতের মুখে এই শাসন-বাক্য শ্রবণ করিয়া দশানন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল—তৎক্ষণাৎ দূতকে বধ করিয়া ফেলিয়া কুবেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আয়োজন করিতে লাগিল।

দিগ্বিজয় যাত্রা

দশানন কুবেরের লঙ্কাপুরী সহজেই কিন্তু লাভ করিয়াছিল। কুবেরের একটি জিনিসের প্রতি তাহার লোভ ছিল—উহা পুষ্পকরথ। পুষ্পক রথটি পাইলে দশাননের ত্রিভুবন জয়ের বড়ই সুবিধা হয়। কৈশোর-কালে দশানন মাতার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে কুবেরের চেয়ে বড় হইবে। কুবেরকে যুদ্ধে পরাস্ত না করিলে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় না। দশানন সেজন্য কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিবার অছিলা খুঁজিতে-ছিল। এতদিনে সেই সুযোগ উপস্থিত।

দশানন সদলবলে কুবেরের অলকাপুরী আক্রমণ করিল। যক্ষেরা সহজে পুরী ছাড়িল না—তুমুল যুদ্ধ করিল—শেষে পরাজিত হইল।

কুবেরের সহিত দশাননের গদাযুদ্ধ হইল। দশাননের গদাঘাতে কুবের মূর্ছিত হইয়া পরিলেন দশানন তখন পুষ্পকরথটি অধিকার করিয়া তাহাতে চড়িয়া বিজয়গর্বে প্রস্থান করিল।

কৈলাস-পর্বতের উপর দিয়া যাইতে যাইতে সহসা পুষ্পকের গতিরোধ হইল। গতিরোধের কারণ কি জানিবার জন্য দশানন রথের বাহিরে আসিল—আসিয়া দেখিল ভীষণকার এক মূর্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই ভীষণ মূর্তিটি স্বয়ং শিবসেবক নন্দী। নন্দী বলিলেন —'পাপিষ্ঠ? কৈলাসের এই অংশ হরপার্বতীর লীলাভূমি, আমি এখানকার প্রহরী—এ পথে কারো অগ্রসর হওয়ার অধিকার নেই। ফিরে যাও, নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।' দশানন কুবেরকে জয় করিয়া বড়ই গর্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে রথ হতে নামিয়া পর্বতকে উপড়াইয়া ফেলিবার জন্য অগ্রসর হইল। নন্দী শূল হস্তে বাধা দিতে আসিলেন। নন্দীর বানরের মত মুখ দেখিয়া দশানন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। ক্রোধে নন্দী অভিশাপ দিলেন—"তুই আমার বানরের মত মুখ দেখে হাসলি, এর প্রতিফল তুই পাবি। বানরের হাতে তুই নির্বংশ হবি। তোকে এক্ষুণি আমি বধ করতাম, কিন্তু তুই নিজ কর্মফলে ধ্বংস হবি—সেটাই ভালো।' নন্দীর এই অভিশাপ দিবামাত্র স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইল এবং পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

ব্রহ্মার বরের প্রভাব ও দশাননের তপস্যার প্রভাব ধ্বংস করিবার জন্য অনেকগুলি অভিশাপের প্রয়োজন হইয়াছিল। নন্দীর অভিশাপই সর্বপ্রথম।

রাবণ নন্দীর অভিশাপকে গ্রাহ্য করিল না—মহাদেবকে ভয় করিল না। কৈলাস পর্বতকে উপড়াইবার জন্য তাহার শৃঙ্গ ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। পর্বত টলমল করিতে লাগিল, পর্বতের প্রমথ গণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। জীবজন্তু ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। স্বয়ং পার্বতী ভয় পাইয়া শঙ্করকে

জড়াইয়া ধরিলেন। তখন মহাদেব বামপদের সমস্ত ভার পর্বতের উপর অর্পণ করিলেন। তাহাতে দশাননের একটি হাত চাপা পড়িয়া গেল। দশানন বিষম যন্ত্রণায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই চীৎকারে সমস্ত ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল। দশাননের আমত্যগণ উপদেশ দিল—'মহারাজ রুদ্রের স্তব করুন—স্তব করুন—আর উপায় নেই।" দশানন প্রাণপণে রুদ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। বহুদিন অবিশ্রান্ত স্তবের পর মহাদেব প্রসন্ন হইয়া দশাননকে মুক্তি দিয়ে বলিলেন—'দশানন, আমি তোমার স্তবে তুষ্ট হয়েছি, তুমি ভীষণ 'রাবের' দ্বারা ত্রিভুবন কম্পিত করেছ, অতএব আজ হতে তোমার নাম হল 'রাবণ'। তুমি এবার যেতে পার।' রাবণ দেখিল, শুভ সুযোগ উপস্থিত, কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল—

'প্রভু, যখন প্রসন্ন হয়েছেন তখন একটা বর দিন। আমি ত ব্রহ্মার বরে প্রকারন্তরে অমর হয়েই আছি। আপনার কাছে আমি একটি অস্ত্র চাই। ঐ অস্ত্রের সাহায্যে আমি যেন বিশ্ববিজয় করতে পারি।'

মহাদেব রাবণকে 'চন্দ্রহাস' খড়গ উপহার দিলেন।

রাবণ এবার আত্মদোষে আর একটি ভীষণ অভিশাপ অর্জন করিল। সে বেদবতী নামে এক তপস্বিনীর তপোবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া অপমান করিল। বেদবতী এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া হোমকুণ্ডেই ঝাঁপ দিলেন। আত্মাহুতি দিবার আগে বলিয়া গেলেন—

'পাপিষ্ঠ—তুই আমার বিঘ্নসাধন করে আমায় অপমান করলি—আমি এক্ষুণি শাপ দিয়ে ভষ্ম করতে পারতাম; কিন্তু তাতে তপঃক্ষয় হবে, সে জন্য ভষ্ম করলাম না। তবে আমি তোর ধ্বংসের জন্য আবার জন্মগ্রহণ করব। কোন মহাজ্ঞানী রাজর্ষির যজ্ঞভূমি ভেদ করে আমি উঠব। তোর কাল পূর্ণ হয়ে এসেছে।"

বেদবতী যখন এই কথাগুলি বলিয়া আ াহুতি দিলেন—তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাবণ কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া সেখান হতে প্রস্থান করিল—যাইতে যাইতে পথে দেখিল—মরুত্ত রাজা যজ্ঞ করিতেছেন। দেবতারা সেই যজ্ঞে সোমপানের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। রাবণ যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র দেবতারা ভয়ে পশুপক্ষী হইয়া আত্মগোপন করিলেন। ইন্দ্র হইলেন ময়ূর, যম হইলেন কাক, কুবের কৃকলাসের ও বরুণ হংসের রূপ ধারণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

রাবণ মরুত্তকে বলিল—"এসো আমার সাথে যুদ্ধ কর, নয়ত বলো পরাজিত হলাম।"

মরুত যজ্ঞভূমি ছাড়িয়া অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। যজ্ঞের প্রধান হোতা সংবর্ত বাধা দিয়া বলিলেন—'মহারাজ, আপনি যজ্ঞে দীক্ষিত এই সময়ে যুদ্ধ করা উচিত নয়—এই মাহেশ্বর যজ্ঞ পণ্ড হলে কুল ক্ষয় হবে। উপরন্তু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জয় হবে কিনা তাই বা কে জানে? দেবতাদের দশা দেখছেন না, রাবণ আসবা মাত্র ভয়ে পশুপক্ষীর রূপ ধারণ করেছেন। এরূপ স্থলে পরাজয় স্বীকার করাই ভাল। তারপর সময় সুযোগ উপস্থিত হলে রাবণকে শাস্তি দিলেই চলবে। মরুত কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া পুনরায় যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিলেন। রাবণের মন্ত্রীরা 'জয় লঙ্কেশ্বরে জয়' বলিয়া সিংহনাদ ছাড়িতে লাগিল।

রাবণ তখন সেখান হইতে নর-লোক জয় করিতে প্রস্থান করিল।

অধিকাংশ রাজাই রাবণের হুঙ্কার শুনিয়া বলিল—'আমরা পরাজিত হইলাম। রাবণ তাহাদের কোন অনিষ্টসাধন না করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। যাহারা যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন,—তাঁহারা প্রাণ হারাইলেন। তাঁহাদের রাজ্যও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এইভাবে রাবণ দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দিগ্বিজয়ের জন্য রাবণকে দোষ দেওয়া যায় না। পরাক্রান্ত

ক্ষত্রিয় রাজা মাত্রই দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতেন—দিগ্বিজয়ী হইয়া দেশে ফিরিয়া রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন।

ক্রমে রাবণ অযোধ্যায় গিয়া উপনীত হইলেন। মহারাজ অনরণ্য তখন অযোধ্যার রাজা। ইক্ষ্বাকু-কুলে সম্মান রক্ষা করিবার জন্য অনরণ্য যুদ্ধ করিলেন—কিন্তু রাবণের হাতে প্রাণ হারাইলেন। মৃত্যুকালে বলিয়া গেলেন—'আমার বংশেই এমন একজন মহাবীর জন্মিবেন—যিনি ইক্ষ্বাকু-কুলের মর্যাদা রক্ষা করিয়া আমার এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন। আমি শাপ দিতেছি তাহার হাতেই তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।'

এই অভিশাপ উচ্চারিত হইবামাত্র স্বর্গে দুন্দভিধ্বনি হইতে লাগিল।

নারদের উপদেশ

দেবর্ষি নারদ দেখিলেন—রাবণ ত নরলোককে উৎসন্নে দিল—এখন উপায়? তিনি মনে মনে একটি অভিসন্ধি আঁটিয়া রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। রাবণ দেবর্ষিকে আসিতে দেখিয়া প্রণত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভু, আপনার আগমণের কি কারণ? দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?'

দেবর্ষি বলিলেন—"বৎস, তুমি এ কি করছ?" মানুষের উপর অত্যাচার করছ? বর-গ্রহণের সময় বলেছিলে, মানুষকে মোটেই গ্রাহ্য কর না। সত্যই ত মানুষ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার যোগ্যও নয়। তবে মানব জাতিকে পীড়ন করছ কেন। মানব অমর নয়—সে জরা, পীড়া, শোক, দুঃখ ও মরণের অধীন। জগতে তার শত্রুর অভাব নাই, সর্বদায় সে বিব্রত-অস্থির-ভয়ে সঙ্কুচিত, নানা জ্বালায় কাতর। তাকে পীড়ন করে তোমার পৌরুষ কি বাড়বে? তুমি দৈত্য, নাগ, গন্ধর্ব ইত্যাদির বিরুদ্ধে অভিযান কর। আর পার যমরাজকে শাসন কর—সেই ত দেখছি এই বিশ্ব-সংসারের রাজাধিরাজ,— এক দেবগণ

ছাড়াত সকলেই তারই অধীনে—তার ভয়ে সবাই কম্পমান। তুমি যদি যমরাজকে জয় করতে পার তবেই বুঝব, তোমার পৌরুষ। আর যমরাজকে জয় করলে তোমার বিশ্বজয় করা হবে। দিগ্বিজয়ের জন্য কাহাতক স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল ঘুরে মরবে? যমকে যদি পদানত করতে পার তাহলে নিজেও অমর হবে।”

রাবণ বলিল—‘পিতামহ, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি যমকে বধ করার জন্য দক্ষিণ দিকে যাত্রা করব। আমিই জীবজগৎকে যম-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ দেব। এ বার্ত্তা ত্রিভুবনে জানাতে পারেন।’

রাবণ যমলোক যাইয়া বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল—ধর্মরাজের রাজ্যে সকল কাজেই বাধা দিতে লাগিলে, পাপীদিগকে দলে দলে নরক হইতে ছাড়িয়া দিতে লাগিল। যমের কিঙ্করগণ রাবণের কাছে যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইলে স্বয়ং যমরাজ ভীষণ কালদণ্ড হস্তে রাবণের সম্মুখীন হইলেন। রাবণকে বধ করিবার জন্য যেমন তিনি অঘোম কালদণ্ড উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি ব্রহ্মা আসিয়া বাধা দিলেন—বলিলেন—“বৎস ধর্ম,—তুমি রাবণকে বধ করো না—আমার বিধানে তোমার কালদণ্ড যার উপর পড়বে সে মরবেই,—আবার আমারই বরে রাবণ দেবতার অবাধ্য। কাজেই আমি উভয় সঙ্কটে পড়লাম। আমাকে মিথ্যাচারী করো না। তুমি রাবণকে ছেড়ে দাও। তুমি অন্তর্হিত হলেই রাবণ চলে যেতে বাধ্য হবে।’

ধর্মরাজ কি করেন,—রাবণকে ছাড়িয়া দিয়া নিজেই অন্তর্হিত হইলেন। রাবণ ‘যমজয়ী হইলাম’ বলিয়া সিংহনাদ ছাড়িতে ছাড়িতে প্রস্থান করিল।

রাবণ এবার দৈত্যলোক বিজয়ে যাত্রা করিল। প্রথমেই তাহার যুদ্ধ বাধিল নিবাতকবচগণের সহিত। পুরা একটি বৎসর তাহাদের সহিত রাবণের যুদ্ধ হইল। কোন পক্ষেই হারজিৎ ঠিক হইল না। তখন নিবাতকবচগণ সন্ধি প্রস্তাব করিল। রাবণও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—সন্ধিতে রাজী হইল। উভয় দলে অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া

বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। রাবণ কিছুকাল দৈত্যপুরীতে বাস করিয়া বিশ্রাম করিয়া লইল। রাবণ শুধু শুধু বিশ্রাম করিবার পাত্র নহে। এই সময় দৈত্যগণের নিকট হইতে মায়াযুদ্ধ শিখিয়া লইল।

তারপর রাবণ গেল কালকেয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে। রাবণের হাতে চারিশত কালকেয় অসুর প্রাণ হারাইল।

এই যুদ্ধে রাবণ একটি বড় অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতে নিজেরই ভীষণ ক্ষতি হইয়া গেল। কালকেয়গণের মধ্যে সুর্পনখার স্বামী বিদ্যুৎজ্জিহ্ব ছিল,—সেও রাবণের হাতে মারা গেল। রাবণ না জানিয়া নিজেই ভগিনীকে বিধবা করিয়া ফেলিল।

রাবণ তারপর বরুণপুরী জয় করিয়া বলিরাজের গৃহে উপস্থিত হইল। রাবণ বলিকে বলিল—'দানবরাজ, বিষ্ণু তোমাকে বন্ধন করেছেন—আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। তোমাকে উদ্ধার করে আবার সিংহাসনে স্থাপন করব। কারো ক্ষমতা থাকে, সে বাধা দিক।'

বলি বলিলেন—'রাবণ, তুমি কেমন বলশালী আগে তার পরীক্ষা করি। ঐ যে অদূরে দেখছ একটা বিরাট কুণ্ডল পড়ে আছে, ঐটা তুমি তুলে নিয়ে এস দেখি।'

রাবণ হাস্য করিয়া বলিল—'এই তোমার পরীক্ষা? আমি কৈলাস পর্বত উৎপাটন করেছিলাম সে খোঁজ রাখ?'

এই বলিয়া রাবণ সেই কুণ্ডলটি তুলিতে গেল; কিন্তু কিছুতেই তুলিতে পারিল না। পরিশ্রান্ত হইয়া মুর্চ্ছা গেল। সংজ্ঞালাভের পর লজ্জিত হইয়া বলির নিকটে আসিয়া বলিল 'এ কুণ্ডল কার'?

বলি বলিলেন—'এ কুণ্ডল আমার প্রপিতামহ হিরণ্যকশিপুর। এঁকে যিনি বধ করেছেন—তিনিই আমাকে বেঁধে রেখেছেন। তাঁরি অবতার কাল-পুরুষরূপে এ পুরীর দ্বারে প্রহরী আছেন। তুমি যদি তাঁকে পরাজিত করতে পারো, তবে আমার মুক্তি হয়।'

রাবণ এই কথা শুনিয়া লম্ফ দিয়া পুরীর দ্বারদেশে আসিয়া কালপুরুষকে আক্রমণ করিল। কালপুরুষ ভাবিলেন—রাবণের কাল

এখনো পূর্ণ হয় নাই, এখন ইহাকে বিনাশ করিব না। এই চিন্তা করিয়া তিনি ধর্মরাজের ন্যায় অন্তর্হিত হইলেন। রাবণ দেখিল,—ইহার সহিত যুদ্ধ চলিবে না। তখন হতাশ হইয়া সুমেরু-শিখরের দিকে যাত্রা করিল। সুমেরু শিখরে বিশ্রামের সময় রাবণ দেখিলেন মান্ধাতা রথে চড়িয়া স্বর্গের দিকে চলিয়াছেন। রাবণ তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। মান্ধাতার সহিত যুদ্ধে রাবণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিল না, কিন্তু যুদ্ধটা এমন ভয়ানক হইয়া উঠিল যে ত্রিলোক কম্পমান। তখন মহর্ষি গার্গ্য ও পিতামহ পুলস্ত্য আসিয়া মাঝে পড়িয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

রাবণের প্রত্যাবর্ত্তন

রাবণ দেখিল—ক্রমেই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে এবং এই দিগ্বিজয়ের ব্যাপারে মাঝে মাঝে তাহার প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হইতেছে। এখন দিগ্বিজয় স্থগিত রাখিয়া কিছুদিন রাজ্যভোগ করা উচিত।

লঙ্কায় ফিরিয়া আসিবামাত্র সুর্পণখা ক্রোধে উগ্রচণ্ডা হইয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। সুর্পণখার বৈধব্য বেশ দেখিয়া রাবণ উত্তেজিত হইয়া বলিল 'ভগিনী একি? তোমাকে বিধবা করল কে? বল এক্ষুণি আমি তার প্রাণ হরণ করব। রাবণের ভগিনীর সর্বনাশ সাধন!'

সূর্পণখা বলিল, 'দাদা, তোমারই এক্ষুণি আত্মহত্যা করা উচিত। তুমিই আমার স্বামীকে বধ করেছ। তোমার কি আত্মপর জ্ঞান আছে? কালকেয়দের সাথে যুদ্ধ করতে গেলে. তাদের মধ্যে যে তোমার ভগিনীপতি ছিল তা কি তোমার খেয়াল ছিল? তুমিই আমাকে বিধবা করেছ। আমাকেই যদি বিধবা করলে তবে তোমার এই দিগ্বিজয়ে কি লাভ?

রাবণ এই কথা শুনিয়া লজ্জিত, অপ্রতিভ, অনুতপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। বহু শোক করার পর

ভগিনীকে প্রবোধ দিয়া শেষে বলিল—'তোমার স্বামীরই আত্মপরিচয় দিয়ে আমার কাছে আসা উচিত ছিল, তার যুদ্ধ করা ঠিক হয়নি।'

সূর্পণখা বলিল—'তুমি কি বল তার ঠিক নেই। তার জন্মভূমি রক্ষার জন্য সে যুদ্ধ করবে না? তোমার লঙ্কা যদি কেউ আক্রমণ করতে আসে, তবে তুমি কি করবে?'

রাবণ বলিল 'যাইহোক ভগিনী, যা হবার তা হয়ে গেছে—এখন তুমি যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পার, তার জন্য কি ব্যবস্থা করব বল।'

সূর্পণখা বলিল—'আমি এ লঙ্কায় থাকব না। আমার অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা কর। আমি কারো অধীনে থাকতে চাই না, আমি স্বাধীনভাবে রাজরাণীর মত থাকব।'

রাবণ বলিল—'তবে তুমি এক কাজ কর। আমাদের মাসতুতো ভাই খর ও দূষণ চৌদ্দ হাজার রাক্ষসবীরের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে বাস করে তুমি সেখানে গিয়ে থাক। তুমি যা বলবে ওরা তাই শুনবে। লক্ষ্মী বোনটি আমার, আমাকে ক্ষমা কর—আমার উপর রাগ পোষণ কর না।'

সূর্পণখা রাবণের প্রস্তাবে রাজী হইয়া দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করিল।

রাবণ তখন মেঘনাদের সন্ধানে গেল—নিকুম্ভিলা নামক উদ্যানে মেঘনাদের দেখা পাইল। রাবণ দেখিল—মেঘনাদ নিকুম্ভিলায় তপোবন রচনা করিয়া ঋষি বেশে সেখানে যাগযজ্ঞ করিতেছে। রাবণ আচার্য্য শুক্রদেবকে জিজ্ঞাসা করিল—'আচার্য্য, মেঘনাদ কি করছে? —মেঘনাদ ঋষি তপস্বীর বেশ ধরে মানুষের অনুকরণ করছে কেন? রাক্ষসপুরে একি অনাচার?'

শুক্রাচার্য্য বলিলেন—'বৎস তুমি এতদিন দিগ্বিজয় করে বেড়াচ্ছিলে—দিগ্বিজয়ে তোমার বিশেষ কি লাভ হয়েছে জানি না। তবে তোমার পুত্র যজ্ঞ করে যা লাভ করেছে—তোমার লাভ তার তুলনায় নগণ্য। তা শুনে তুমি অবাক হয়ে যাবে। মেঘনাদ তোমার চেয়ে ঢের

বড় শক্তিশালী বীর হয়ে উঠেছে অবশ্য তাতে তোমারি গৌরব। লোকে অন্য সবার সঙ্গে সংগ্রামে জয় চায়। পুত্রের কাছে চায় পরাজয়। মেঘনাদ ইতিমধ্যে অগ্নিষ্ঠোম, অশ্বমেধ, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব, প্রভৃতি সাতটি মহাযজ্ঞ সাধন করেছে। মাহেশ্বর যজ্ঞ করে শিবের নিকট হ'তে বর লাভ করেছে—ইচ্ছামত আকাশ বিহার করবার ক্ষমতা পেয়েছে—নানাপ্রকার মায়াবিদ্যা শিখেছে—এমনভাবে গোপন করে আকাশ থেকে যুদ্ধ করতে পারে যে, দেবমানব কেউ তাকে দেখতে পাবে না। এছাড়া—অক্ষয় তুনীর পেয়েছে, আর এমন সব অস্ত্র পেয়েছে যা একেবারে অমোঘ। এমন সব মন্ত্র শিখেছে যে তাদের প্রভাবে মেঘনাদ বিশ্ববিজয়ী হতে পারবে সে কোন অনাচারই করে নাই। বিশ্ববিজয়ী হবার জন্য যা যা দরকার সে সবই অধিগত করেছে।'

রাবণ শুনিয়া খুব খুসী হইল এবং পুত্রকে সগৌরবে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্বাদ করিল।

রাবণ কিছুকাল শান্তিতে রাজত্ব করিবার জন্য রাজপুরীতে প্রবেশ করিল; কিন্তু রাবণের ভাগ্যে বিধি শান্তিময় জীবনের ব্যবস্থা করে নাই। বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র বিভীষণ রাবণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বিভীষণ বলিলেন—

'তুমি ব্রহ্মার বর পেয়ে দর্পে অন্ধ হয়েছ। তুমি মিছিমিছি কেন ত্রিভুবনকে অস্থির করে তুলেছ? তুমি কয়েক বৎসর যত জীবের প্রাণ বিনাশ করেছ,—এক শতাব্দীতে তত জীব সম্ভবতঃ মরে না। এত রাজ্য তুমি উৎসন্নে দিয়েছ যে—তার গণনা করা যায় না। বিশ্বের এত অকল্যাণ তুমি করেছ—যে সহস্রও বৎসরেও তার পূরণ হবে না। সহস্র সহস্র নারীকে হরণ করে নিয়ে এসেছ, তাদের অভিশাপে তোমার নির্বংশ হবে। এদিকে তোমার অন্তঃপুর হতে তোমার মাসতুতো ভগিনী কুম্ভীনসীকে যে মধু দৈত্য হরণ করে নিয়ে গেল, তার খোঁজ রাখ কি? এতবড় অপমানটা তোমার পাপেই সহ্য করতে হল।" রাবণ বলিল—'কি বাতুলের মত বকছ? এও কি

সম্ভব? রাবণের অন্তঃপুর হতে ভগিনী-হরণ? বল কি? তোমরা কি মরেছিলে?' বিভীষণ বলিল—'আমি তপস্যার জন্য অন্যত্র গিয়েছিলাম, কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত, মেঘনাদ যজ্ঞে দীক্ষিত। বাকী সকলকে মধু অনায়াসে পরাস্ত করে কুন্‌ভীনসীকে হরণ করে নিয়ে গেল। আমি তপস্যান্তে ফিরে এসে শুনেই মধু দৈত্যের শাসনের জন্য গেলাম; কিন্তু তার প্রতি কুম্ভীনসীর অনুরাগ দেখে তাকে ক্ষমা করে ফিরে এলাম।' রাবণ বিভীষণকে ভৎসনা করিয়া তৎক্ষণাৎ মেঘনাদকে সঙ্গে লইয়া মধু দৈত্যকে বধ করিবার জন্য যাত্রা করিল। মধু পুরীতে পৌঁছাইবামাত্র কুন্‌ভীনসী আসিয়া রাবণের চরণে পতিত হইল এবং বলিল—'দাদা আমার স্বামীকে বধ করো না। দিদিকে বিধবা করেছ, আমাকে আর বিধবা করো না। স্বামী আমাকে হরণ করে এনেছেন, কিন্তু বিবাহ করেছেন—আমি তার ধর্মপত্নী।' এই কথা শুনিয়া রাবণের ক্রোধের উপশম হইল।

স্বর্গবিজয়

রাবণ দেখিল—মধু দৈত্যকে ত বধ করা চলে না। তখন মধুকে বলিলেন—'দেখ আমি যখন সসৈন্যে যাত্রা করে বেরিয়ে এসেছি,—তখন শুধু শুধু ফিরে যাব না,—চল, দেবলোক জয় করে আসি। মেঘনাদ একাই দেবতাদের স্বর্গ হতে তাড়িয়ে দেবে; আমরা তার সহায়তা করব।'

তখন দৈত্য ও রাক্ষস সৈন্য একত্রে মিলিত হইয়া দেবলোকের পানে যাত্রা করিল। রাবণ দেবলোক আক্রমণ করিয়া দেবগণকে উদ্বাস্ত করিয়া তুলিল। দেবতারা তখন বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া বলিল—'প্রভু, রক্ষা করুন, স্বর্গরাজ্য রসাতলে যায়—আমাদের আর নিস্তার নাই। নিজে যুদ্ধে অবতীর্ণ হোন, নতুবা সৃষ্টি লোপ পাবে।' বিষ্ণু বলিলেন—'আমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কি করব? ব্রহ্মা যে বর দিয়ে রেখেছেন—তাতে রাবণকে বধ করা চলবে না। যুদ্ধ

তোমরাই কর! শেষে আমাকেই রাবণকে বধ করতে হবে, কিন্তু দেবতা হয়ে করলে চলবে না—মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে। তোমরা কয়েক বৎসর কোন প্রকারে রাবণকে ঠেকিয়ে রাখ,—আমি শীঘ্রই নররূপে অবতীর্ণ হব।'

অগত্যা ইন্দ্র নিজেই যুদ্ধের জন্য বিরাট আয়োজন করিলেন, আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুৎগণ, রুদ্রগণ, সকলকেই আহ্বান করিলেন। দেবতাদের মধ্যে ত্বষ্ঠা ও পুষা রাবণের সম্মুখীন হইলেন—জয়ন্ত মেঘনাদকে আর অষ্টমবসু (যিনি পরে ভীষ্ম হইয়া জন্মিবেন) রাবণের মাতামহ রাক্ষসগণের কুলপতি সুমালীকে রণে আহ্বান করিলেন। বসুর সেলাঘাতে সুমালীর পতন হইল।

সুমালীর পতনে মেঘনাদ কুপিত হইয়া জয়ন্তের দিকে ধাবমান হইল। জয়ন্ত কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না দেখিয়া তাহার মাতামহ দৈত্যরাজ পুলোমা তাঁহাকে লইয়া পালাইয়া গেল। জয়ন্ত পরাভবে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র মেঘনাদকে আক্রমণ করিলেন। মেঘনাদ আকাশে অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, ইন্দ্র কিছুতেই তাহার মায়াজাল ভেদ করিতে পারিল না। ইন্দ্র নিজেও মায়াবিদ্যা কম জানেন না। কথায় বলে ইন্দ্রের মায়াজাল। —কিন্তু মেঘনাদের মায়াবিদ্যার তুলনা নাই। মেঘনাদ মায়াবলে ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া ফেলিল। দেবলোকে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেবগণ ভয়ে দিগ্বিদিকে পলাইতে লাগিল।

মেঘনাদ পিতাকে বলিল—'বাবা, আর আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। দেবলোকের অধিশ্বরই যখন বন্দী, তখন আমরা ত্রিলোক বিজয়ী। আসুন এখন আমরা লঙ্কায় ফিরি।'

রাবণ মেঘনাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া লঙ্কায় ফিরিল। লঙ্কায় ফিরিবামাত্র দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মা আকাশ হইতে রাবণকে বলিলেন—'বৎস তোমার উপযুক্ত পুত্র মেঘনাদের বলবিক্রম দেখে বিস্মিত হয়েছি। তুমি ত্রিলোক বিজয়ী তা আমরা স্বীকার করি।

তোমার প্রতিজ্ঞা ত পূর্ণ হল, —এখন ইন্দ্রকে মুক্ত কর। এর জন্য তোমাকে কি মূল্য দিতে হবে, বল। আজ হতে মেঘনাদ জগতে ইন্দ্রজিৎ নামে পরিচিত হবে।'

মেঘনাদ উত্তরে বলিল—'প্রভু,—আপনার কথাতে ইন্দ্রকে মুক্ত করে দিচ্ছি, কিন্তু আমার অমরত্ব-বর চাই।'

ব্রহ্মা বলিল—'বৎস, অমরত্ব-বর দিবার উপায় নাই। এ বর যে কাউকে দিইনি বা দিতে পারি না তা নয়, তবে পশুবল বা দৈহিক বিক্রমের জন্য তা দেওয়া যায় না। যাকে অমরত্ব-বর দিলে দেব মানবের অকল্যাণের সম্ভাবনা আছে, তাকে দিতে পারি না। তোমার সৌর্য্য-বীর্য্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি—কিন্তু তুমি কোন তপস্যা করনি। তাছাড়া, দেবতার অকল্যাণ সাধনেই তোমার শৌর্য্য-বীর্য্য প্রয়োগ করেছ। এরূপ ক্ষেত্রে তোমাকে অমরত্ব-বর দিলে ত্রিলোকের কাছে আমি নিন্দনীয় হব। তোমার খুল্লতাত বিভীষণ মহাতপস্বী—তাকে না চাইতে অমরত্ব-বর দিয়েছি। জানি তার দ্বারা ত্রিলোকে ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট হবে না। তুমি অন্য বর চাও।'

মেঘনাদ তখন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—"তবে আমাকে এই বর দিন যে, আমি বিধি পূর্বক মন্ত্র দ্বারা অগ্নি পূজা করে যুদ্ধযাত্রা করলে অজেয় ও অবধ্য হব। অগ্নির উপাসনা করলে অগ্নি হতে রথ উঠবে—সেই রথে বসে যতক্ষণ যুদ্ধ করব ততক্ষণ অমরই হব।"

ব্রহ্মা বলিলেন —'তথাস্তু'। ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলেন। ইন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মা দেবলোকে ফিরিয়া গেলেন। ইন্দ্র তখন ব্রহ্মাকে বলিল—"পিতামহ, আমার আর স্বর্গরাজ্য প্রয়োজন নেই, আপনি যাকে খুসী তাকে স্বর্গরাজ্য দান করুন। এমন রাজ্যে আমার কি লাভ? আজ আমার যে অপমান হল, তাতে আর স্বর্গে কেন—মর্ত্যেও আমার রাজত্ব করা চলে না। আপনি আমাকে স্বর্গের সিংহাসন দিয়েছেন—আর যত দৈত্য, দানব, রাক্ষসদের বরদানে অজেয় করে রেখেছেন। তারা আপনার প্রসাদে প্রায় অমর —বীর্য্য

বলে আমার চেয়ে বেশী। এরূপ ক্ষেত্রে আমার স্বর্গ-সিংহাসনে লাভ কি?"

এই বলিয়া ইন্দ্র আক্ষেপ করিতে লাগিল।

ব্রহ্মা বলিলেন—"বৎস, আশ্বস্ত হও। তুমি যেমন আমার পৌত্র, দৈত্য-দানব-রাক্ষসরাও তেমনি আমার পৌত্র বা প্রপৌত্র। তুমি যেমন তপস্যা করেছ, তারাও তেমনি তপস্যা করেছে। বল দেখি, আমি কি করি? আমার পক্ষপাতিত্ব কি সাজে? দৈত্য দানবরা উগ্রতপ করলেও আমি তাদের কিছুতেই অমরত্ব বর দিই নি - কি করে তাদের বধ করা যেতে পারে, তার উপায় ঠিক করে—তবে তাদের বর দিই। তোমার এই যে লাঞ্ছনা হল –তারও সঙ্গত কারণ আছে। তুমি এক সময়ে বড় ভীষণ পাপ করেছিলে। মহর্ষি গৌতম তোমার গুরু—তাঁর প্রতি তোমার ব্যবহারের কথাটা স্মরণ কর দেখ।"

ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন এবং বলিলেন—"পিতামহ, আমার পুত্র জয়ন্ত কোথায়? তাকে যে পাচ্ছি না—তাকে ফিরে না পেলে আমার স্বর্গেও সুখ নেই।"

ব্রহ্মা বলিলেন—'উৎকণ্ঠিত হয়ো না। তোমার শ্বশুর পুলোমা তাকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় রণস্থল হতে নিয়ে গিয়ে যত্নেই রক্ষা করেছেন।' ইন্দ্র তখন আশ্বস্ত হইলেন।

আবার দিগ্বিজয়

মেঘনাদের বলে বলী হইয়া রাবণ আর একবার নরলোক বিজয়ে যাত্রা করিল। রাবণ শুনিয়াছিল, নর্ম্মদা তীরে মাহিষ্মতীপুরীর রাজা অর্জুনের সমকক্ষ বীর পৃথিবীতে নাই। এই অর্জুন হৈহয়দের রাজা কৃতবীর্য্যের পুত্র। ইহার এক সহস্রহস্ত,—তদনুযায়ী বিরাট শরীর। রাবণ সসৈন্যে নর্ম্মদা তীরে উপস্থিত হইয়া মাহিষ্মতীপুরী আক্রমণ করিয়া দশ কণ্ঠে হুঙ্কার করিতে লাগিল। অর্জুনের সেনাপতি

অগ্রসর হইয়া বলিলেন—'লঙ্কেশ্বর আপনি অপেক্ষা করুন, রাজা নর্ম্মদায় সলিল-বিহারে গিয়েছেন। তিনি প্রভাতে আপনাকে যুদ্ধ দান করবেন। যদি অপেক্ষা না করেন—তবে ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন।'

রাবণ বলিল—'তোমরা কীটানুকীট, নগণ্য মানুষ, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব আমি? আমি দেবলোক জয় করে এসেছি, ইন্দ্রকে বন্দী করেছি, যম, বরুণ, কুবের ও আদিত্যগণকে পরাজয় করেছি—তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে আমার মানহানি হবে। কোথায় সে অর্জুন এখনি বল, আমি অপেক্ষা করতে পারছি না।'

অর্জুনের মন্ত্রী তখন নর্ম্মদা নদীর দিকে রাবণকে যাত্রা করিতে বলিলেন। রাবণ বিন্ধ্য পর্বতের উপর হইতে অর্জুনকে দেখিতে পাইল। অর্জুন হাজার হাতে নর্ম্মদা স্রোতঃপ্রবাহ রোধ করিয়া ধারাকে উজান বহাইয়া দিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার রাণীরা সন্তরণ করিয়া জলকেলি করিতেছেন।

রাবণ হুঙ্কার করিয়া অর্জুনকে রণে আহ্বান করিল। অর্জুন আর্দ্র বসনে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া নিরস্ত্র অবস্থাতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাবণ যত অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল—অর্জুন সে সবই কোন না কোন হাতে ধরিয়া ফেলিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন সর্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া অর্জুনকে কিছুতেই পরাজিত করিতে না পারিয়া রাবণ শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল ; তখন অর্জুন রাবণকে হাজার হাতে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। রাবণকে বন্দী দেখিয়া রাবণের অনুচরগণ একযোগে অর্জুনের দেহে শেল-শূল-মূষল-মুগুর ছুড়িতে লাগিল - কিছুতেই কিছু হইল না। মেঘনাদও কিছুতেই পিতাকে মুক্ত করিতে পারিল না। অর্জুন রাবণকে বন্দী করিয়া একটি অন্ধকারময় কারাগৃহে তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন।

অর্জুনের ইচ্ছা ছিল, একটি বিরাট যজ্ঞ করিয়া তাহাতে দেবতা ও ঋষিগণকে আহ্বান করিয়া সর্বসমক্ষে যজ্ঞের বলিস্বরূপ রাবণকে বধ করিবেন। কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। রাবণের

পিতামহ পুলস্ত্য মাহিষ্মতীপুরীতে উপস্থিত হইয়া অর্জুনকে বলিলেন —'বৎস, ছুবৃত্তের যথেষ্টই দণ্ড হয়েছে। আর কখনও ও পাষণ্ড কারো সঙ্গে অযথা যুদ্ধ করতে যাবে না। এ যাত্রা ওকে ছেড়ে দাও। তুমি যথার্থ বীর.—তোমার কাছে রাবণ ক্ষমা প্রার্থনা করবে, ওকে বধ করো না।' দেবর্ষির আদেশে অর্জুন রাবণকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। রাবণ অর্জুনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং উভয়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইল।

পুলস্ত্য রাবণকে বলিলেন—'বৎস, আর স্থানে অস্থানে পাষণ্ডপনা করতে এস না। এ যাত্রা তোমাকে বাঁচিয়ে দিলাম। ভবিষ্যতে বিপদে পড়িলে আর সাহায্য পাবে না' রাবণ মস্তকগুলিকে অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

অর্জুনের কাছে রাবণের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়া গেল। রাবণের মন্ত্রীগণ ও অনুচরগণ ভাবিয়াছিল—রাবণ আর অকারণে কাহারও রাজ্য আক্রমণ করিবে না। কিন্তু রাবণ কখনও স্থির হইয়া লঙ্কায় বাস করিতে পারে না। একদিন শুনিল, বানরগণের রাজা বালীর পরাক্রম ও শৌর্য্য জগতে অদ্বিতীয়। শ্রবণমাত্র রাবণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল সে কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বালী তখন অনুপস্থিত। বালীর শ্বশুর অগ্রসর হইয়া বলিল—

'রক্ষোরাজ বালী এখন পুরীতে নাই—তাই রক্ষা পেয়ে গেলে। বালীর বিক্রমের তুমি কথা জান না। আজ পর্যন্ত কেউ তার সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারেনি। ঐ দেখছ সাদা রঙের একটি পাহাড়— ওটা হাড়ের পাহাড়। বালীর সঙ্গে যারা যুদ্ধ করতে এসেছে—তাদেরি হাড়ে ঐ পাহাড়টি তৈরী। ঐটিকে দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়। কেন বাপু আয়ু থাকতে প্রাণ হারাবে?'

রাবণ শুনিয়া কুপিত হইয়া বালীর শ্বশুরকে মারিতে উদ্যত হইল। তখন বালীর শ্বশুর বলিল—"দেখছি, তোমার কাল পূর্ণ হয়েছে। তবে শোন, বালি এখন দক্ষিণ সমুদ্রে সন্ধ্যা-বন্দনা করতে গিয়েছে,—যদি তোমার মরণে ত্বর না সয়—সেখানে যাও।'

এই কথা শুনিয়া রাবণ দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে আসিয়া দেখিল— বালী সন্ধ্যা-বন্দনাই করিতেছে।

সন্তর্পণে নিকটে গিয়া পিছু হইতে রাবণ বালীকে যেমন ধরিবার চেষ্টা করিবে, অমনি বালী পিছু ফিরিয়া রাবণকেই ধরিয়া বগলে দাবিয়া চারিটি সমুদ্র ঘুরিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিল। হতদর্প রাবণ মৃত সর্পের মত বালীর বামকক্ষ হইতে ঝুলিতে লাগিল। দুই প্রহর পরে বালী যখন রাবণকে মুক্তি দিল তখন রাবণের সংজ্ঞা নাই।

বহুক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য সঞ্চার হইল। রাবণ বালীর চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল—'ভাই, আমার বড় ভুল হয়ে গেছে,—তোমার বিক্রম যে এত বেশী তা কল্পনা করতে পারি নি। আমার কেমন স্বভাব কারো তেজোবিক্রম, শৌর্য্য-বীর্য্য আমার চেয়ে বেশী এই কথা শুনলেই আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। আজ হতে তুমি আমার মিত্র হলে, আমাকে সখ্যসূত্রে বদ্ধ করে ধন্য কর।

বালী উদার চরিত্রের মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি শরণাগত ও পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করিতে জানিতেন,—তৎক্ষণাৎ হোমকুণ্ডে অগ্নি জ্বালিয়া অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া রাবণের সঙ্গে বন্ধুতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। রাবণের দিগ্বিজয় পিপাসা এইখানে নিবৃত্ত হইল— রাবণ ইহার পর আর কাহারও সহিত স্বেচ্ছায় বল-পরীক্ষা করিতে যায় নাই।

সূর্পণখার লাঞ্ছনা

কয়েক বৎসর পরের কথা। রাবণ একদিন রাজ-সভায় বসিয়া আছে—এমন সময় তাহার ভগিনী সূর্পণখা আলুথালু বেশে কাঁদিতে কাঁদিতে কালবৈশাখী ঝড়ের মত সেখানে উপস্থিত হইল। রাবণ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ভগিনী, একি ব্যাপার! তোমার এমন দশা কেন? তোমাকে এমন বিকলাঙ্গীই বা কে করলে?'

সূর্পণখা বলিল—'এতদিনে বুঝলাম, তুমি অতি অপদার্থ। তুমি সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নও। আমার যে কি অপমান, কি গঞ্জনা কি-নির্য্যাতন হয়ে গেল— তাঁর কোন খোঁজ রাখ কি? তোমার ভাই খর-দূষণ ও তোমার সেনাপতি ত্রিশিরা চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের সঙ্গে যমালয়ে গেল,—তার কোন খোঁজ রাখ কি? তুমি ত্রিভুবন বিজয় করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ, আর ভেবেছ তোমার ভয়ে দেব-দানব-দৈত্য

সবই কম্পমান,—কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করতে সাহসই করবে না। এই ব্রহ্মাণ্ডটা নিতান্তই ছোট নয়। নূতন নূতন বীর যে তৈরী হতে পারে, তা তোমার দশটা মাথার বুদ্ধিতে আসে না। বৃথাই তুমি দশটা মাথার ভার বও। মানুষকে তুমি অবহেলা কর,—মানুষের মধ্যেই এমন সব বীর জন্মাচ্ছে,—যারা তোমার রাজ্য ছারখার করে দিতে পারে, দশটি মাথাই সাবাড় করতে পারে। হয়তো মানুষের হাতেই তুমি শেষ পর্য্যন্ত মরবেও।'

রাবণ অধীর হইয়া সিংহনাদে গর্জিয়া বলিয়া উঠিল—

'কে, কোন পাষণ্ড, তোমার এ দুর্দশা করেছে বলো, এক্ষুণি বলো। এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করো না। কার এত সাহস যে ভুবন বিজয়ী রাবণের ভগিনীর লাঞ্ছনা করে? স্বর্গ-বিজয়ী ইন্দ্রজিতের গুরুজনের

এ হেন দুর্গতি করে? কার এত বলবিক্রম যে আমার বাছাবাছা চৌদ্দ হাজার রাক্ষস সৈন্য ধ্বংস করেছে। সূর্পণখা তুমি কি পাগল হয়েছ? খর-দূষণের মত বীর সামান্য মানুষের হাতে মরেছে, বল কি?'

সূর্পণখা বলিল—'অত উত্তেজিত হয়ো না, শেষ পর্যন্ত শোন। তারপর চেঁচামেচি করো। অযোধ্যার রাজা দশরথের দুই পুত্র সত্য-রক্ষার জন্য পঞ্চবটীতে এসে বাস করছে। তারাই আমার এ দুর্দশা করেছে। সসৈন্যে খর-দূষণকে বধ করেছে। তাদের বলবিক্রম সত্যই অদ্ভুত ”

রাবণ বলিল—'তারা বিনা কারণে তোমাকে এমন লাঞ্ছিত করলে?'

সূর্পণখা বলিল—'তারা ত কিছুকাল হতে দণ্ডকারণ্যের রাক্ষস-বংশ ধ্বংস করছে। তুমি রাজত্ব কর, না ছাই করো।

সে খোঁজ কি তুমি রাখ? তুমি আছ দিগ্বিজয়ের তালে, আর এদিকে তোমার বাড়ীর দুয়ারে রাক্ষস-কুল ধ্বংস পাচ্ছে। ঋষিরা রাম-লক্ষণের শরণাপন্ন হয়েছিল। তারা ঋষিদের অভয় দিয়ে রাক্ষস-কুল ধ্বংসের ব্রত গ্রহণ করেছে। তাদের সঙ্গে একটি যুবতী আছে। যুবতীটি বড় ভাই রামের স্ত্রী। এমন সুন্দরী নারী তুমি কখনো চোখে দেখ নি। মন্দোদরী তার পায়ের নখের যোগ্যও নয়। তাকে দেখে আমার মনে হলো,—সামান্য মানুষের স্ত্রী হ'বার কথা তার নয়, তুমিই তার উপযুক্ত স্বামী। আমি রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইকে বধ করে তাকে তোমার জন্য আনবার চেষ্টা করেছিলাম, এই আমার অপরাধ। রামের ছোট ভাই লক্ষ্মণ আমার নাক-কান কেটে দিল। আমি রক্ত মুছতে মুছতে খরের কাছে এসে জানালাম। তারপর খরদূষণ ত্রিশিরা চৌদ্দ হাজার রাক্ষস সৈন্য নিয়ে দুভাইকে আক্রমণ করলে, তারা সব ধ্বংস পেয়েছে।”

রাবণ বলিল—'একজনও বেঁচে নেই। বল কি? তাজ্জব ব্যাপার। তুমি আমার কাছে আগেই এলে না কেন?'

সূর্পণখা বলিল, 'আমি ভেবেছিলাম, ছুটো মানুষকে মারবার জন্য কেন তোমার কাছে আসব, খরদুষণই যথেষ্ট। কিন্তু দেখছি এরা সামান্য মানুষ নয়।'

রাবণ তখন সূর্পণখাকে আশ্বাস দিয়া বলিল—"তুমি বিশ্রাম কর গে, তোমার লাঞ্ছনার প্রতিহিংসা সাধন না করে আমি জল-গ্রহণ করব না। তোমাকে আমি জীবনে সুখী করতে পারিনি। তোমার সকল দুঃখের মূল আমি। তোমার অপমানের যদি প্রতিশোধ না লই, তবে আমার রাবণ নামে ধিক্, আমার বিশ্ববিজয়ে ধিক্। সামান্য মানুর অপমান করে লঙ্কেশ্বরের ভগিনীর! আমি এক্ষুণি রামের স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে আসছি।'

সীতাহরণ

সূর্পণখার কথায় উত্তেজিত হইয়া রাবণ রথে চড়িয়া জনকতক দুর্দ্ধর্ষ অনুচর সঙ্গে দণ্ডকারণ্য অভিমুখে যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে হঠাৎ কি মনে হইল, মারীচের আশ্রমে নামিল। মারীচের আশ্রম! এটা একটা অদ্ভুত কথা সন্দেহ নাই।

মারীচ রামের বাণে বিকলাঙ্গ হইয়া রাক্ষসী বৃত্তি ছাড়িয়া মুনি বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। সমুদ্র তীরে একটি আশ্রম রচনা করিয়া সে সেখানে তপস্বর্য্যায় দিনপাত করিত। রাবণ মারীচের নিকটে যাইয়া আপন সঙ্কল্প জানাইল এবং বলিল—'তোমাকে এক কাজ করতে হবে। তোমাকে সোনার হরিণের রূপ ধরে রামসীতার কুটীরের সামনে ঘুরতে হবে। সীতা নিশ্চয়ই তোমাকে ধরে দেওয়ার জন্য আবদার ধরবে—তখন তুমি রামকে ভুলিয়ে দূরে নিয়ে যাবে তারপর কিছু দূরে গেলে রাম যখন তোমাকে বাণে বিদ্ধ করবে—তখন রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে 'হা সীতা'! 'হা লক্ষ্মণ' বলে চীৎকার করবে, তখন লক্ষ্মণও ছুটে আসবে। এই অবসরে আমি সীতাকে হরণ করে নিয়ে চলে আসব। এত আয়োজনের কারণ কি জান?—রামলক্ষ্মণ

সোজা বীর নয়। তারা যখন চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের সঙ্গে খর-দূষণকে অক্লেশে বধ করেছে—তখন মুখোমুখি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সীতা হরণ সম্ভব হবে না—কৌশল ছাড়া উপায় নেই।

তুমি ছাড়া এ কৌশল আশ্রয় করতে আর কেউ পারবে না। রামলক্ষ্মণের প্রতি তোমার সঞ্চিত ক্রোধও রয়েছে—তোমাকে তো তারা কম কষ্ট দেয়নি। প্রতিহিংসা নেওয়ার শুভ অবসর এসেছে। যদি এতে তোমার মৃত্যু হয়—তাতেই বা দুঃখ কি? তোমার তো জীবনে আর কোন লোভ নেই। বেঁচে থেকেও তোমার লাভ নেই। বয়স অনেক বেশী হয়েছে—মৃত্যুকাল তো আসন্ন। মরবার আগে নিজের ক্ষোভটা মিটিয়ে নাও—আমারও একটু উপকার করে যাও! কেমন? সম্মত তো?'

মারীচ চুপ করিয়া রাবণের কথাগুলি শুনিল—তারপর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—'দেখ রাবণ! তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে। নিশ্চয়ই তোমার কোন শত্রু তোমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে। সে কৌশলে তোমাকে সবংশে নিপাত করতে চায়! রামলক্ষ্মণ—বিশ্বামিত্রের প্রসাদে ত্রিভুবন বিজয়ী, কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না। তুমি তাদের যুদ্ধ দেখনি, তাদের কি রূপ শাস্ত্রজ্ঞান তা তুমি কল্পনাই করতে পার না। তারা মানুষ বটে, কিন্তু এমন মানুষ ভূভারতে কখনো জন্মায়নি। তারপর সীতাকে হরণ করবে তুমি? রাজর্ষি

জনক দেবগণেরও পূজ্য, তার তপঃ ও পুণ্য ফল এত বেশী যে তিনি যদি ইন্দ্রত্ব চান, তবে শত মন্বন্তর ইন্দ্রত্ব ভোগ করতে পারেন। তার কন্যা সীতা! এই সীতার তুল্য সাধ্বীসতী পতিব্রতা ত্রিভুবনে নেই। তাকে যদি হরণ কর, তবে তোমার দশটি মাথা পঞ্চবটীর ধুলাতেই গড়াগড়ি যাবে। তারপর লঙ্কার চিহ্নমাত্রও থাকবে না। তোমার বয়সও তো কম হল না। ব্রহ্মার বরে বল বিক্রম তো পেয়েছ অসাধারণ, কিন্তু তোমার ঘটে একটা বানরেরও বুদ্ধি নেই। দশটা মাথার ভার বয়ে মর, একটা মাথারও বুদ্ধি নেই। সূর্পণখার অপমান করেছে রামলক্ষ্মণ! কি গুণের ভগিনীই লাভ করেছ! কেন অপমান করেছ জান? তার জন্য সবংশে মরবে? এ সঙ্কল্প ছেড়ে দাও!'

রাবণ বলিল—'মারীচ তুমি বুড়ো হয়ে আর রামের বাণ খেয়ে নিতান্ত ভীরু হয়ে পড়েছ। আমি ত্রিভুবন অজেয়। তুমি জান আমি দেবতাদের সকলকে পরাজিত করেছি, ইন্দ্রকে বেঁধে এনেছিলাম, ত্রিভুবনে আমার সমকক্ষ বীর নেই। আমি সামান্য মানুষকে ভয় করব? তার আগে আমার মরণই ভাল। তুমি কি বলতে চাও মহাসমুদ্র পার হয়ে আমি শেষে গোষ্পদে ডুবে মরব? সীতা হরণ আমি করবই। কেন করব, তোমায় বলছি, রামের সঙ্গে আমার অনেক দিনের শত্রুতা। সীতাকে বিবাহ করার ইচ্ছা আমার অনেক দিন হতেই ছিল। জনকরাজা হরধনু ভঙ্গের পণ করায় আমার বিবাহ করা হয়নি। বহু কষ্টে শিবের প্রসাদ লাভ করে-ছিলাম, তাঁর ধনুক ভেঙ্গে শেষে তার কোপে পড়ব, এই ভয়ে ধনুক ভাঙ্গা হয়নি। সেই সীতাকে রাম বিবাহ করেছে। তারপর রাম তাড়কা ও সুবাহুকে বধ করেছে। তাড়কা ও সুবাহু আমার নির্দেশেই তোমার সঙ্গে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করতে গিয়েছিল। তার হাতে তোমারও লাঞ্ছনা কম হয়নি। রাম দণ্ডকারণ্যে এসে অবধি কেবলি রাক্ষস বধ করছে। তারপর সূর্পনখার অপমান—খরদূষণ বধ। প্রতিহিংসা নিতে হলে সীতাহরণ করতে হবে।"

মারীচ বলিল—'সবই বুঝলাম—তোমার যুক্তি! কিন্তু রাক্ষস বংশ ধ্বংস করবার অধিকার তোমার নেই, তুমি নিজে মরবে, সমূলে রাক্ষস বংশ ধ্বংসও করবে।'

রাবণ বলিল—'দেখ মারীচ, আমার আর সময় নেই। আমার আর ত্বরা সহ্য হচ্ছে না। তোমার বড়ই স্পর্দ্ধা, আমার নির্দেশ অবহেলা করে আমার সঙ্গে তর্ক করছ। রাবণ জীবনে কাউকে তার কাজের জন্য কৈফেয়ৎ দেয়নি। আমার কথাই আদেশ। তুমি যদি রাজী না হও—প্রস্তুত হও, ভগবানের নাম কর, এই খড়গাঘাতে তোমার ঋষিলীলা সাঙ্গ করি।'

মারীচ বলিল—'তুমি ক্ষান্ত হও, মিছে আমাকে ভয় দেখিও না। আমার প্রাণের মমতা নেই। তুমি আমাকে মৃত্যুর জন্যই মায়া হরিণের রূপ ধরতে বলছ। যাই করি না কেন, আমার মরণ-কাল আসন্ন! তোমার হাতে মরার চেয়ে রামের হাতে মরাই ভাল। তাতে আমার দুই কাজই হবে, রামের হাতে মরে মুক্তি পাব, তোমার মত পাষণ্ডকেও সবংশে ধ্বংস করতে পারব। চল, আমি যাচ্ছি।'

তারপর মারীচ রাবণের কথামত কাজই করিল। রাবণও একজন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া সীতার কুটীরে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা চাহিল। রাবণ কেবল ভিক্ষা চাহিল না, সীতাকে লক্ষ্য করিয়া এমন সব অমর্য্যাদাসূচক কথা বলিতে লাগিল, তাতে সীতার কুপিত হইবার কথা। কিন্তু সীতা বর্ণাশ্রম—ধর্ম শাসিত রাজপরিবারের কন্যা ও বধু। একে অতিথি, তাহাতে ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক, তাঁহাকে সমাদর করিয়া আসন ও পাদ্যদান করিতে বাধ্য হইলেন।

রাবণ সুযোগ বুঝিয়া চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে সীতাকে লইয়া রথে তুলিল। সীতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং যথোচিত ভর্ৎসনা ও শাপ-শাপান্ত করিতে লাগিলেন। নিষ্ঠুর রাবণের হৃদয় গলিল না। সীতার চীৎকারে বৃদ্ধ জটায়ুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। জটায়ু ছুটিয়া আসিয়া রাবণের রথের গতিরোধ করিলেন, অনেক

কাকুতি মিনতি করিয়া রাবণকে বুঝাইতে লাগিলেন,—অনেক ধর্ম-শাস্ত্রের দোহাই দিলেন,—অনেক প্রকারের ভয়ও দেখাইলেন। কিছুতেই রাবণ বিচলিত হইল না। তখন জটায়ু চঞ্চু, নখ ও পাখার সাহায্যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রাবণের রথ চূর্ণ হইল—অনুচরগণ ও সারথি হত হইল—রাবণের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। জটায়ু চঞ্চুর দ্বারা রাবণের দশটা হাতই ছিঁড়িয়া দিলেন। রাবণ ভূমিতলে অবতরণ করিয়া বাকী দশ হাতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ যুঝিয়া বৃদ্ধ জটায়ু ক্লান্ত, আহত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। রাবণ তখন খড়গের সাহায্যে জটায়ুর পক্ষ ছেদন করিয়া সীতাকে কক্ষে লইয়া আকাশ-পথে প্রস্থান করিল। সীতা 'হা রাম, হা লক্ষ্মণ, হা তাত জটায়ু' বলিয়া প্রাণপণে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং নিজ অঙ্গের অলঙ্কারগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন।

লঙ্কাদাহন

রাবণ লঙ্কাপুরীতে লইয়া গিয়া সীতাকে বশীভূত করিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল, — বলিল "দেবি, আমার বলবীর্য্যের প্রমাণ পেলে, আমি বিশ্ব-জয়ী। আমার ঐশ্বর্য্য দেখ, জগতে আমার চেয়ে ঐশ্বর্য্যশালী রাজা কেউ নেই। আমার পুত্রগণ আমারই সমকক্ষ। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজীৎ আমার চেয়েও পরাক্রমশালী,—সে ইন্দ্রকেও বেঁধে এনেছিল। সামান্য মানুষের পত্নী হয়ে থাকা তোমার পক্ষে কি গ্লানি কর বল দেখি! তুমি একটা ভিখারীর সঙ্গে বনে কষ্ট পাচ্ছিলে, তোমাকে আমি পাটরাণী করব, আমার দশটি মাথা তোমার পদপীঠ হবে। হাজার হাজার রাণী তোমার পদসেবা করবে, তুমি লঙ্কেশ্বরী হয়ে আমাকে শাসন করবে"।

সীতা রাবণের এই কথা শুনিয়া ক্রোধে একেবারে অগ্নিশিখা-ময়ী হইয়া বলিলেন—'পাষণ্ড এত সাহস, তোর দশমুখে আমি পদাঘাত করি। কাপুরুষ! বনের মধ্যে একটা অসহায়া নারীকে একলা

পেয়ে তুই হরণ করে নিয়ে এসেছিস, আর তাতেই তুই বলবিক্রমের অহঙ্কার ক'রিস্। নির্লজ্জ, ভীরু, চোর। তুই সব অত্যাচার করতে পারিস্ আমার মৃত্যু বারণ করতে পারিস না। পূনরায় তুই যদি এরকম কথা বলিস্ তবে এক্ষনই আত্মহত্যা করব'।

রাবণ আবার নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাহাতে সীতার ক্রোধ আরও উগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল। রাবণের মনে পড়িল ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাবণ সীতাকে অশোক বনে বন্দী করিয়া রাখিল এবং রাক্ষসী চেড়ীগণকে আদেশ দিল তাহারা যেন অনবরত সীতাকে নানাভাবে নির্য্যাতন করে। কয়েক মাস অতীত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে রামচন্দ্র বালীবধ করিয়াছেন, সুগ্রীবের সহিত মৈত্রীস্থাপন করিয়াছেন। তারপর লঙ্কায় অভিযানের জন্য বানর সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। হনুমান লঙ্কায় আসিয়া সীতাকে রামের অঙ্গুরী অর্পণ করিয়া সংবাদ দিলেন,—'দেবি, আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, তিনি সসৈন্যে আসছেন'।

হনুমান কেবল সীতাকে সংবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হইলেন না। লঙ্কায় অশেষবিধ উৎপাত আরাম্ভ করিলেন। তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য রাক্ষসগণ অগ্রসর হইল। কিন্তু তাঁহার হাতে দলে দলে তাহারা মরিতে লাগিল। তখন রাবণের আদেশে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। ইন্দ্রজিতের মায়াজালে হনুমান বাঁধা পড়িলেন। রাবণ আদেশ দিল,—"এক্ষণি বানরটাকে বধ কর।"

বিভীষণ বললেন "দাদা, দূত অবধ্য, ওকে বধ করবেন না। বানরকে ওপারে ফিরে যেতে দিন। সে গিয়ে আপনার ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্যবীর্য্য, জনবল ও নিজের লাঞ্ছনার কথা রাম লক্ষ্মণকে জানাক। ভয় পেয়ে তারা আর লঙ্কায় অভিযানের সাহসই করবে না। জগজ্জয়ী রাবণ দূতরূপে আগত একটা বানরকে নিজের রাজসভার মধ্যে হাতে পেয়ে বধ করেছে, একথা শত্রুপক্ষ শুনলে কি বলবে? আপনার পৌরুষের মর্য্যাদা কোথায় থাকবে?"

বিভীষণের কথায় রাবণ নিরস্ত হইল, কিন্তু বলিল, "ওকে মেরে ফেলে কাজ নেই, ওর লেজে আগুন ধরিয়ে দাও।"
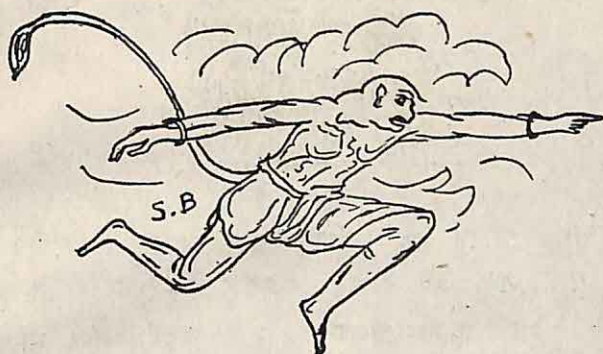
তখন হনুমানের লাঙ্গুলে তৈলসিক্ত কাপড় জড়াইয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল। তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। হনুমান তখন লম্ফ দিয়া ছাদে উঠিয়া সমগ্র লঙ্কাপুরীতে আগুন লাগাইয়া দিল। হনুমান সমুদ্রজলে তাহার লাঙ্গুলের আগুন নিভাইয়া ফেলিলেন।

হনুমান রাবণকে রাজসভায় যে রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাই রাবণের যথার্থ রূপ, হনুমান দেখিলেন—

রাক্ষসরাজ রাবণ সভাস্থলে উপবিষ্ট, তাঁহার মস্তকগুলিতে মুক্তাজাল খচিত স্বর্ণমুকুট, সর্ব্বাঙ্গে হীরক-শোভিত মনিময় অলঙ্কার। তাহার দেহ রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত, তাঁহার পরিধানে মহামূল্য পট্টবসন, তাহার ওষ্ঠ লম্বিত। বক্ষঃস্থল ঐরাবতের দন্তাঘাতে লাঞ্ছিত। উত্তরীয় শশক—রক্তের মত লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। শৃঙ্গশোভিত মন্দর—পর্বতের মত দশটি মস্তকে তিনি শোভা পাইতেছেন। তাহার বর্ণ কজ্জলের ন্যায় নীল, বক্ষে স্বর্ণহার। তাহার এক একটি বাহু পঞ্চফনযুক্ত বিরাট সর্পের মত, তাহাতে অঙ্গদ শোভা পাইতেছে। তাঁহার আসন স্ফটিকময় ও রত্নখচিত। বহু সংখ্যক সুবেশা রমণী তাহাকে চারিদিকে

ঘিরিয়া চামর ব্যজন করিতেছে। চারিজন মন্ত্রী অদূরে বসিয়া তাঁহাকে মন্ত্রনা ও আশ্বাস দান করিতেছে।”

“হনুমান রাবণের রূপ দেখিয়া তাহার তেজে বিমোহিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই বীরের কিরূপ! কি ধৈর্য্য! কি শক্তি! কি কান্তি! সর্ব্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ! যদি অধর্ম বলবৎ না হইত, তাহা হইলে ইনি চিরদিনের জন্য সুরলোকের রক্ষক হইতেন।”

(বাল্মীকির রামায়ণ)

বিভীষণের বিদায়

হনুমানের কাণ্ড দেখিয়া রাবণ ভীত হইয়া পড়িল—বুঝিল রাম-লক্ষ্মণ সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় অভিযান করিবে। একজন বানরও যখন সমুদ্র পার হইয়াছে—তখন সকলেই সমুদ্র পার হইতে পারিবে। একা হনুমান হয়ত সমস্ত ব্যবস্থা করিবে। হনুমানকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। বিভীষণের উপর রাবণের দারুণ ক্রোধ জন্মিল।

রাবণ মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করিল—“এখন কি কর্ত্তব্য? যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হব—না—সীতাকে ফিরিয়ে দেব? তোমরা যা বলবে তাই শুনব। তোমাদের বলেই আমার বল, তোমাদের সাহসেই আমার সাহস।”

মন্ত্রীগণ একে একে সকলেই বলিল,—সীতাহরণের পূর্ব্বে যদি মন্ত্রনা জিজ্ঞাসা করতেন, তবে আমরা নিষেধই করতাম। যখন হরণ

করে এনেছেন, তখন বিনা রণে ফিরিয়ে দিলে অপমানের অবধি থাকবে না। দেব দানব কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। লঙ্কার গৌরব রাখতে হলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।”

বিভীষণ বলিলেন—“দাদা, আমার মতে সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়াই সঙ্গত। পরস্ত্রীহরণ মহাপাপ। ক্রোধবশে হরণ করেছিলেন। এখন সে ক্রোধ দূর হয়েছে, এখন ফিরিয়ে দেন, তাতে কোন অপমানই নেই। রামলক্ষ্মণের কোন অপরাধই নেই। সূর্পণখার প্রতি তাঁরা যে আচারণ করেছেন, তা সূর্পণখার প্রাপ্য। আর যদি এ বিষয়ে রামলক্ষ্মণের অপরাধ হয়ে থাকে তার দণ্ড যথেষ্ঠ হয়েছে। আর কেন ? ধর্মাধর্মের কথা ছেড়ে দিলেও সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়া সঙ্গত, হনুমানের কাণ্ড দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। রামের দলে এই রকম বীর কত জন আছে কে জানে ? সীতাকে ফিরিয়ে দিলে যদি লঙ্কাপুরী বাঁচে, রাক্ষসকুল বাঁচে, তবে সমগ্র কুলের জন্য, সমগ্র লঙ্কার জন্য আপনি এই টুকু ত্যাগ স্বীকার করুন, যদি একটু অগৌরবই হয় হোক্, রাক্ষস বংশটা বেঁচে থাক।”

রাবণ বলিল—“বিভীষণ, তোমার কথার কিছু যুক্তি আছে, কিন্তু তুমি ছাড়া সকল মন্ত্রীই অন্য প্রকার উপদেশ দিচ্ছেন। ইন্দ্রজিৎও যুদ্ধের জন্য ব্যাকুল। এরূপস্থলে কি করা যায় ? একবার কুম্ভকর্ণকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।”

কুম্ভকর্ণ এই সময় ২।৪ দিনের জন্য জাগিয়াছিল। রাবণ তাহার পরামর্শ জানিতে চাহিল।

কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিল—“তুমি বড় অন্যায় কাজ করেছ। আমি যদি জেগে থাকতাম,—তবে তোমাকে এমন অন্যায় কাজ কিছুতেই করতে দিতাম না। তুমি যতবার দিগ্বিজয় যাত্রা করেছ, একবারও নিষেধ করি নি। পরাক্রমশালীর পক্ষে তাহা অন্যায় নয়। কিন্তু নিরপরাধ দুর্বল মানুষের অসহায়া স্ত্রীকে হরণ করে আনা যেমন মহাপাপ,—পৌরুষের পক্ষে তেমনি অমর্য্যাদাকর। এতবড় ঘৃণিত কাপুষের মত কাজটা তুমি কেন করলে ? ধিক্

তোমাকে। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এ বিষয়ে বিভীষণের সঙ্গে আমার মতের প্রভেদ নেই। তবে বিভীষণ সীতাকে ফিরিয়ে দিতে বলছে,—আমি, বলি না। যখন কুকার্য্য করেই ফেলেছ, তখন আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য যুদ্ধও করতে হবে। সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়া চলতে পারে না।”

কুম্ভকর্ণের শেষ কথা শুনিয়া রাবণ আশ্বস্ত হইল।

বিভীষণ কিন্তু কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অনবরতই কেবল সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই বিষয় লইয়া বিভীষণের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের অনেক তর্কাতর্কি হইয়া গেল। রাবন তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে বলিল—"বিভীষণ, তুমি জ্ঞাতিশত্রু—তোমার সঙ্গে একত্র বাস সসর্প গৃহ-বাসের তুল্য। তুমি আমার অমঙ্গল চিন্তা করছ। তুমি দূর হও। অন্য কেই হ'লে এক্ষণি শিরচ্ছেদ করতাম।”

বিভীষণ তখন চারিজন সহচরের সঙ্গে রাবণের রাজসভা হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"আপনি আমার গুরুজন, আপনাকে হিতবাক্য বললাম, শুনলেন না। আমি আর এ পাপ - সংসর্গে থাকতে চাই না। আপনার আসন্নকাল উপস্থিত। লঙ্কা শ্মশান হবার আগেই আমি পথ দেখলাম। দেখি আপনার ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত আপনাকে কেমন করে রক্ষা করেন।”

মাল্যবান্

ইত্যবসরে রামচন্দ্র সেতুবন্ধন করিয়া বানর-সৈন্য লইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। সাগর-তীরে তাঁহার শিবির সংস্থাপিত হইল। রাবণ চর পাঠাইয়া রামের বলাবল জানিয়া লইল। সহসা রাবণের মাথায় একটি কুবুদ্ধি আসিল। বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক এক রাক্ষসকে রামের মায়ামুণ্ড ও মায়া ধনুক সৃষ্টি করিয়া অশোকবনে লইয়া যাইতে

আদেশ দিল এবং নিজে সীতার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল—"সীতা, আর কেন? এইবার আমার রাণী হতে তোমার আর আপত্তি কি? তোমার রামচন্দ্র তো আর ইহজগতে নেই। কাল রাত্রে যখন রাম তার শিবিরে নিদ্রিত ছিল, তখন আমার চরগণ বানরের মূর্তি ধরে সেই শিবিরে প্রবেশ করে তার মাথাটি কেটে এনেছে, তার ধনুকটিও নিয়ে এসেছে। লক্ষ্ণ কোথায় পালিয়েছে। আর হনুমানের হনু ভেঙ্গে দিয়েছে, বিভীষণকে বন্দী করে এনেছে—সুগ্রীবের গ্রীবাই উড়ে গেছে, বিনা যুদ্ধেই সব শেষ করা গেছে। আর কেন বৃথা আশায় আছ! চল, আমার অন্তঃপুরে চল।"

এমন সময় বিদ্যুজ্জিহ্ব রামের ছিন্নমুণ্ড ও তাঁহার শরাসন আনিয়া সীতার সম্মুখে ফেলিল। সীতা তাহা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাসনে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পরে যখন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন সরমা কানে কানে বলিলেন—"দেবী. সব রাক্ষসী মায়া, কিছু বিশ্বাস করো না। রাক্ষস রাজের দশা শোচনীয়—তা না হলে মায়া বিস্তার করে তোমাকে বিপন্ন ও বশীভূত করার চেষ্টা কেন? ছিঃ, ছিঃ, ধিক্ ধিক্ রাক্ষসরাজকে। এই কি বীরের ধর্ম? এই পৌরুষেরই কিনা তিনি গৌরব করেন? মায়া বিস্তার করে শেষে অবলা বধ করতে চান।"

রামচন্দ্র সৈন্যগণসহ লঙ্কাপুরীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন; তূরী ভেরী ও শঙ্খধ্বনির দ্বারা সে বার্তা লঙ্কার দিগদিগন্তে ঘোষিত হইল। রাবণ সভায় বসিয়া মন্ত্রিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তোমাদের মুখে উৎসাহের চিহ্ন দেখছি না কেন? তোমরা পরস্পর মুখ তাকা-তাকি করছ কেন?"

রাবণের মাতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান্ বলিলেন—"বৎস, এখনো সময় আছে রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি কর। সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নতুবা তোমার রক্ষা নেই। তুমি বিশ্ব-বিজয়ী, ব্রহ্মার বরে অজেয়, স্বীকার করি। কিন্তু সকল জিনিসেরই একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে। তুমি যে তপ করেছিল—তা অনন্ত নয়। তারও একটা আয়ু আছে। এতদিন ধরে যে পাপচরণ করলে, তাতে

তোমার তপোবল নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার বাহুবল অমিত, সন্দেহ নেই, কিন্তু তুমি ঐ বলের বহুকাল ধরেই ব্যবহার করছ—তারও একটা নির্দিষ্ট পরমায়ু আছে, অনবরত প্রয়োগে ও বয়োবৃদ্ধিতে সে বল ক্রমেই কমেই আসছে। এখনও তোমার যে সৈন্যবল আছে, তা ত্রিভুবনে কারো নেই–তোমার সৈন্যগণ বলশালী ও মায়াবী। কিন্তু রামের বানর সৈন্য, তাদের তুলনায় যে একেবারে দুর্বল, তা'ত মনে হয় না। ধরো, হনুমানের কথা। সে লম্ফদানে সাগর অতিক্রম করেছে, সেও কামরূপ, সে নানা আকার ধারণ করতে পারে। একা হনুমান লঙ্কা-পুরীকে ছারখার করে দিয়ে গিয়েছে। তার লাঙ্গুলে আগুন ধরালে, লাঙ্গুল পুড়ল না, তোমার লঙ্কাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। হনুমানও মায়াবী! এই রূপ মায়াবী ও বলশালী বীর বানর সৈন্য দলে ক'জন আছে তারই বা কি ঠিক? তপস্যা একা তুমি করনি—একা তুমি বর লাভ করনি। ওরা কত তপস্যা করেছে, কত প্রকার বর লাভ করেছে, তারই বা কি ঠিক? সমুদ্রে সেতু বন্ধনের কথাত কল্পনাই করতে পারনি, তাও'ত সম্ভব হয়েছে। কোন মায়াবলে তা সম্ভব হয়েছে তাইবা কে জানে?

বালীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তোমার কি দুর্দশা হয়েছিল, মনে পড়ে? সেই বালীকে তিনি বধ করেছেন, তিনি তোমার চেয়ে কত

বড় বিক্রমশালী বীর, ভেবে দেখ। বালীর পুত্র অঙ্গদ যুদ্ধে এসেছেন, বালী ভ্রাতা সুগ্রীব এসেছেন। এরা যদি বালীর সমকক্ষ নাও হন—তোমার যে সমকক্ষ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারপর হৈহয়রাজা অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তুমি বন্দী হয়েছিলে, সেই অর্জুনকে বধ করেছিলেন পরশুরাম। সেই পরশুরামের দর্প হরণ করেছেন রামচন্দ্র। বৎস, রামচন্দ্রের পরাক্রমের পরিমাণটা একটু ভেবে দেখ দেখি।

তারপর রামচন্দ্র হয়ত ইত্যবসরে ভরতকে সংবাদ পাঠিয়েছেন। ভরতও ভারতবর্ষের রাজন্যগণের সমস্ত সৈন্য নিয়ে হয়ত আসছেন। ত্রিভুবনে সকলকেই তুমি উদ্বাস্ত করেছ, দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ সকলেই তোমার শত্রু।

এই সুযোগে সকলেই তোমাকে জব্দ করবার চেষ্টা করবে। রাম-চন্দ্রের পক্ষে তোমার সর্বশ্রেণীর বৈরীগণই সমবেত হবেন। আমার তো মনে হয়, তোমার ভাই স্বয়ং কুবেরই হয়ত রামচন্দ্রকে সহায়তা করতে আসছেন। এতকাল ধরে তুমি ঋষিগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছ, তাঁরা তাঁদের মন্ত্রবল ও তপোবল দ্বারা রামচন্দ্রকে নিশ্চয়ই সহায়তা করবেন।

"রামচন্দ্র যদি আর কোন সাহায্য নাও পান—সত্য ও ধর্ম তার পক্ষে। কোটি কোটি লাঞ্ছিত ও লাঞ্ছিতার অভিশাপ,—লক্ষ লক্ষ সতী নারীর হাহাকার,—আর তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রতিহিংসা রামচন্দ্রের অক্ষয় তূণে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। আমি জানি, তুমি ইন্দ্রজিতের ভরসায় রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছ। ইন্দ্রজিৎ ছাড়া আর কোন রাক্ষসের ক্ষমতা নেই—হনুমান, রাম বা লক্ষ্মণের সম্মুখীন হয়। কুম্ভকর্ণ সে ত সর্বদাই নিদ্রালু। তাকে ঘুম হতে জাগিয়ে যুদ্ধ করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। তোমার বিজ্ঞ ভাই বিভীষণকে তাড়িয়ে ভাল কর নি। সে রামের পক্ষে যোগ দিয়ে তোমাকে বড়ই দুর্বল করে ফেলেছে—সে তোমার গৃহ-ছিদ্র সবই

ওদের দেখিয়ে দেবে। লঙ্কাপুরীর প্রত্যেক রন্ধ্রটি আজ শত্রুর নখ-দর্পণে।

তুমি ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছ,—দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, নাগ ও গন্ধর্বের হাতে তোমার মৃত্যু হবে না। কিন্তু নর-বানরে হাতে তোমার মৃত্যু কে রোধ করবে? যাদের তুমি অগ্রাহ্য করেছিলে—তারাইত তোমার প্রধান বৈরী।"

"আর একটি কথা তোমায় বলে রাখি। আমার ঘোরতর সন্দেহ, এই রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু ও সীতা স্বয়ং লোকমাতা লক্ষ্মী। আমি ঋষিদের মুখে শুনেছি ভূভার-হরণের জন্যও তোমার মত বিশ্ব-পীড়ককে বধ করবার জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ যুগে যুগে অবতীর্ন হন। দশানন, আমি তোমার মাতামহ,—রাক্ষসকুলের আমিই বৃদ্ধতম ব্যক্তি আমার উপদেশ শোন—যুদ্ধে বিরত হও। রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি কর।"

মাল্যবানের এই প্রকার যুক্তিযুক্ত হিত-বাক্য রাবণের অসহ্য হইল। রাবণ কোপে অন্ধ হইয়া বলিল,—"মহাস্থবির জরাগ্রস্ত হয়ে তোমার বলবিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। বৃদ্ধের উপদেশ শ্রোতব্য স্বীকার করি। কিন্তু তোমার মত অতি বৃদ্ধে ও বালকে কোন তফাৎ নেই চারিদিকে যখন রণোৎসাহ, তখন তুমি সকলকে নিরুৎসাহ করতে আরম্ভ করেছ। শত্রুপক্ষের বলের পরিমাণটা খুব অতিরঞ্জিত করে বলে তুমি আমার যুদ্ধদ্যম নষ্ট করতে চাও। তোমার মনে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। তুমি শত্রুপক্ষেরই লোক ; নয়ত তুমি আমায় হিংসা কর। একসময়ে তুমি রাক্ষসকুলের অধীশ্বর ছিলে,—এই লঙ্কারই অধিপতি ছিলে, আজ তুমি অপদস্থ হয়ে আম র অনিষ্ট চিন্তা করছ।

তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি। জরদ্গব, দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষদের চেয়ে মানুষ কখনও বেশী বলবান হতে পারে? বানরের পাল নিয়ে কেউ কখনও যুদ্ধ করতে পারে? এখনো বলছি তুমি মানে মানে রাজ-সভা ত্যাগ করো। তোমার কথাগুলো শেষ পর্য্যন্ত শুনে তোমাকে যথেষ্ট সম্মান করেছি।"

মাল্যবান লজ্জিত ক্ষুব্ধ ও হইয়া সভা ত্যাগ করিয়া চিরদিনের মত চলিয়া গেল।

যুদ্ধারম্ভ

লঙ্কার পূর্বদ্বারে মহাবীর প্রহস্ত, দক্ষিণ দ্বারে মহাপার্শ্ব ও মহোদর পশ্চিম দ্বারে ইন্দ্রজিৎ এবং উত্তর দ্বারে স্বয়ং রাবণপুরী রক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। রামপক্ষ হইতে স্থির হইল,--নীল প্রহস্তকে, অঙ্গদ মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে, হনুমান ইন্দ্রজিৎকে এবং রামচন্দ্র রাবণকে আক্রমণ করিবেন। যুদ্ধটা কিন্তু আরম্ভ করিয়া দিল সুগ্রীব। রাবণকে দেখিয়া সুগ্রীবের ধৈর্য্য—চ্যুতি হইল। সে এক লম্ফে রাবণের স্কন্ধে পড়িল, পদাঘাতে তাহার মুকুটগুলি চূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। তখন দুইজনের মধ্যে বহুক্ষণ ধরিয়া মল্লযুদ্ধ চলিতে লাগিল। রাবণ এই মল্ল যুদ্ধে কাতর হইয়া পড়িল এবং শেষে রাক্ষসী মায়া বিস্তার করিয়া সুগ্রীবকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিল। সুগ্রীব অভিসন্ধি বুঝিয়া বিজয় গৌরবে এক লম্ফে রামের নিকট উপস্থিত হইল। সূত্রপাতেই রাবণ কেমন যেন অপ্রতিভ, হতবুদ্ধি ও হতোদ্যম হইয়া পড়িল। রাবণ শুক ও সারণকে উত্তর দ্বারের ভার দিয়া রাজসভায় চলিয়া আসিল।

এদিকে সুগ্রীব রামের নিকট ফিরিয়া গেলে রাম তাহাকে মৃদু ভৎ সনা করিয়া বলিলেন—"সখে,—তোমার এরূপ সাহস করা ভাল হয়নি। আমার বিনা অনুমতিতে একেবারে রাবণের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করতে যাওয়া বড় অসঙ্গত কাজ হয়েছে। যুদ্ধের নিয়মানুসারে এখনও দূত পাঠান হয় নি। তোমার যদি একটা কিছু হয়ে যেত,—তাহলে সব পণ্ড হত।" সুগ্রীব বলিলেন—"সখে,—রাবণকে দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়ে গেল।"

তার পর অঙ্গদ রামের পক্ষ হইতে দূতরূপে রাবণের সভায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে যথোচিত কটুবাক্য বলিয়া রামের বার্ত্তা জ্ঞাপন

করিল। বার্ত্তাটি এই—"এখনো যদি ভাল চাস্, সীতাকে ফিরিয়ে দে,—নতুবা সবংশে ধ্বংস পাবি।" ইহার উত্তরে রাবণ অঙ্গদকে বধ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। অঙ্গদ রাবণের প্রাসাদশিখর চূর্ণ করিয়া অক্লেশে রামের নিকট ফিরিয়া আসিল।

এই বার রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ রামলক্ষ্মণকে না পাশে বন্দী করিয়া ভাবিলেন,—রামলক্ষ্মণ হত হইয়াছে। সানন্দে ও সগৌরবে এই সংবাদ সে পিতার নিকট জানাইল। রাবণের পুরীতে উৎসব চলিতে লাগিল। রাবণ নিশ্চিন্ত হইয়া সুরাপান করিতে লাগিল। ত্রিজটাকে আহ্বান করিয়া রাবণ, বলিল,—"পুষ্পক রথে সীতাকে চড়িয়ে রণস্থলে রাম-লক্ষ্মণের মৃত দেহ দেখিয়ে এসো।" ত্রিজটা রাবণের আদেশক্রমে সীতাকে পুষ্পক বিমানে চড়াইয়া রণস্থলের উপর লইয়া গেল। সীতা দেখিলেন,— রাম-লক্ষ্মণ শরশয্যায় শায়িত,—বানরগণ চারিপাশে হাহাকার করিতেছে—বিভীষণ গালে হাত দিয়া শিয়রে বসিয়া আছেন। সীতা

এই দৃশ্য দেখিয়া শোকে আকুল হইয়া পুষ্পক হইতে ঝাঁপ দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তখন ত্রিজটা বলিল—"দেবী, রাম-লক্ষ্মণ নাগপাশে চেতনা হারাইয়াছেন—তাঁদের মৃত্যু হয় নি, দেখ না, মুখশ্রী বিবর্ণ হয় নি; মহাত্মা বিভীষণ সত্বরই ওদের চৈতন্য সম্পাদন করতে পারবেন।"

ত্রিজটা সান্ত্বনা-বাক্যে সীতা কতকটা আশ্বস্ত হইলেন।

এদিকে রাত্রি শেষ হইবার আগেই রাবণের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল,—বানর শিবির হইতে সে হর্ষধ্বনি ও জয়নাদ শুনিতে পাইল। তখন সংবাদ লইয় জানিল,—রাম-লক্ষ্মণ কোন উপায় নাগপাশ হইতে পরিত্রান পাইয়াছে। তখন রাবণের উৎকণ্ঠার অবধি থাকিল না। ইন্দ্রজিতের অমোঘ অস্ত্র ব্যর্থ হইল, —তবে কি রক্ষকুলের আর রক্ষা নাই? রাবণ তখন কুপিত হইয়া একে একে লঙ্কার শ্রেষ্ঠ বীরগণকে যুদ্ধে পাঠাইতে লাগিল। ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, প্রহস্ত, অকম্পন ইত্যাদি একে একে হত হইলে একসঙ্গে অনেকগুলি বীরকে সঙ্গে লইয়া রাবণ নিজেই রনে আসিল, এই অভিযানে আসিল—ইন্দ্রজিৎ, অতিকায়, মহোদর, বজ্রপিশাচ, ত্রিশিরা, কুম্ভ, নিকুম্ভ, নরান্তক ইত্যাদি—

রামচন্দ্র রাবণকে এই প্রথম দেখিলেন, দেখিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—"এই রাক্ষসরাজ কি তেজস্বী! এই বীর স্বীয় প্রভাজালে সূর্য্যের মত দুর্দ্দর্শন। ইহার সর্বাঙ্গে তেজঃপুঞ্জে আচ্ছন্ন বলিয়া আমি উহাকে সম্যকরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না। ইহার যেমন দেহভাগ্য,—কোন দেবদানবের এরূপ দেহভাগ্য নাই। ভীমদর্শন ভূতগণে পরিবেষ্টিত যেন সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার। (মূল রামায়ণ)

রাবণ যখন দেখিল—লঙ্কার সমস্ত বীর রনসাজে সজ্জিত,—কেহই লঙ্কাপুরীর অন্তঃপুর রক্ষার জন্য নাই—তখন রণক্ষেত্র হইতে কতগুলি দুর্দ্ধর্ষবীরকে পুরদ্বার রক্ষার জন্য পাঠাইলেন।

রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রথমেই অগ্রসর হইল সুগ্রীব। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সুগ্রীব ভগ্নগ্রীব ও সংজ্ঞা শূণ্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

রাবণ সুগ্রীবকে বলিল—"তুই আমার পরম বন্ধু বালীর সহোদর, তোকে প্রাণে মারলাম না। তুই ভেবেছিস,—তোর ভ্রাতা আমাকে পরাজিত করেছিল—তার বিক্রম বুঝি তোরও আছে ?"

তারপর আসিল—গবয়, গবাক্ষ, সুষেণ, ঋষভ, নল ইত্যাদি বানর বীরগণ। তাহারা রাবণের শানিত শর সহ্য করিতে না পারিয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল। তখন আসিলেন লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণের রক্ষক আসিলেন হনুমান। লক্ষ্মণ সমরে রাবণকে যখন অস্থির ও নিরুপায় করিয়া তুলিলেন—তখন রাবণ ময়দানব-দত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিলে সেই শক্তিতে লক্ষ্মণ হতচেতন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণকে ভূপতিত দেখিয়া হনুমান রাবণের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া রাবণকে এমন মুষ্টি প্রহার করিলেন যে, তাহাতে রাবণ রথের উপর পড়িয়া রক্ত বমন করিতে লাগিল। সেই অবসরে হনুমান লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে করিয়া রামের নিকট আনিয়া দিলেন। রাম তখন কুপিত হইয়া রাবণের সম্মুখীন হইলেন। হনুমানের আঘাতে রাবণ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—তার পর রামের শর সহ্য করিতে না পারিয়া রাবণ পরাজিত হইয়া প্রাণ ভয়ে রাজপুরীর দিকে প্রস্থান করিল।

কুম্ভকর্ণ

হতদর্প রাবণ তখন বুঝিল, রাম সাধারণ মানুষ নয় এবং বোধ হয় তাহার লীলাবসান আসন্ন—মন্ত্রিগণকে বলিল—"দেখ, আজ পরাস্ত হয়ে মনে পড়ছে, গত জীবনের অভিশাপের কথা। অনরণ্য রাজার মৃত্যুকালের অভিশাপ এবার বোধহয় ফলতে চলল। বেদবতী, নন্দী, উমাদেবী এবং বহু ঋষি, তপস্বী ও সতীনারী আমাকে যে সব শাপ দিয়েছেন, বোধহয় সেই পুঞ্জীভূত অভিশাপের এইবার ফলভোগ করতে হবে। রামের হাতে আমার যে পরাজয় হয়েছে, তাতে যেন আমার শক্তি-সামর্থ্য সব কমে গেছে, মনটাও দমে গেছে। আমি পরাস্ত, অবসন্ন, আহত ও উৎসাহহীন, আমার যেন অস্ত্র-ধারণের ক্ষমতা নেই।

তোমরা সত্বর একটা ব্যবস্থা কর। শীঘ্র কুম্ভকর্ণকে জাগাও নতুবা আর নিস্তার নেই।”

রাবণের আদেশে রাক্ষসগণ বহু চেষ্টায় কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রা-ভঙ্গ ঘটাইল। অকালে নিদ্রাভঙ্গের জন্য কুম্ভকর্ণ বিরক্ত হইয়া টলিতে টলিতে রাবণের নিকট গমন করিল।

রাবণ বলিল, “ভাই, আমার বড় বিপদ। সেজন্য অকালে তোমার ঘুম ভাঙ্গালাম। লঙ্কা আজ বীরশূন্য। ইন্দ্রজিৎ, মহোদর ইত্যাদি মাত্র কয়েকজন বীর জীবিত আছে, রাজকোষে আর অর্থ নাই, আহরণের অসুবিধা ও অবরোধের জন্য খাদ্যাভাব ঘটেছে, অস্ত্রাগারও ক্রমে নিঃশেষ হয়ে এসেছে, লঙ্কাপুরী এখন কেবল স্ত্রীলোক ও বালকে পরিপূর্ণ। আমি কাল রামের হাতে আহত ও পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছি। তুমি ছাড়া আর রক্ষা নেই।”

কুম্ভকর্ণ বলিল—“আমি আর কি করব? লঙ্কায় এত বীর থাকতে দুইজন মানুষ যদি লঙ্কাকে ছারখার করে দেয়, বিশ্ব বিজয়ী তুমি যদি পরাভূত হয়ে ফিরে এসে থাক, তবে আমি একা কি করতে পারি? তুমি আপন বুদ্ধিতে কাজ কর, গুণবান জ্ঞানবান ভাই বিভীষণের উপদেশ তুমি শুনলে না। সে মনের দুঃখে শত্রুপক্ষে যোগ দিল। বুদ্ধিমতী রাণী মন্দোদরীর উপদেশ তুমি কানে তুললে না। নিজ বুদ্ধিতে এই বিপদ ঘটালে, এখন কুম্ভকর্ণ তোমাকে কেমন করে বাঁচাবে? ব্রহ্মার বরে অলৌকিক শক্তি পেয়ে তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তৃণ জ্ঞান করলে, সত্যকে পদদলিত করলে, ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখলে না। ধর্মকে নানারূপে বিড়ম্বিত করলে, দশহাতে তুমি জয়—গৌরব লুটেছ, স্বীকার করছি; কিন্তু আর দশহাতে নিখিলের অভিশাপ তুমি কুড়িয়ে আনলে। ন্যায়, সত্য, ধর্ম সবই তোমার বিরুদ্ধে। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ—সব তোমার বৈরী। দৈব তোমার মাথায় খাঁড়া ধরে আছে, আমি তোমাকে কেমন করে বাঁচাব? তুমি পরস্ত্রী হরণ করে যে মহাপাপ করেছ, তার দণ্ড তোমাকেই ভুগতেই হবেই। আর

তোমার মত মহাপাপীকে যারা দুষ্কর্মে সহায়তা করেছে, উৎসাহ দিয়েছে, মন্ত্রণা দিয়েছে, প্রতিবাদ না করে তোমার সকল পাপাচারে সায় দিয়ে গেছে, তারা মরবে। কেউ তাঁদের বাঁচাতে পারবে না। কুম্ভকর্ণ কেন ?—স্বয়ং প্রপিতামহ ব্রহ্মাও না। এতদিন ধরে এত যে কাণ্ড করেছ, কখনও আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেছিলে ? আজ বিপদে পড়ে আমার বলবীর্য্যের সহায়তা চাচ্ছ। আমি না হয় নির্বোধ, নিদ্রালু ও জড়বৎ। আমাকে উপেক্ষা করবে কর; কিন্তু মহাপুরুষ ভাই বিভীষণকে উপেক্ষা করলে কি করে ? নেহাৎ তোমার মরণ আসন্ন, নতুবা তাকে তুমি অপমান করে তাড়াও! তুমি আমার ভাই, তোমার প্রতি আমার কর্তব্য স্বীকার করি, বিভীষণও তো আমার ভাই তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে আমাকে কত ব্যথা দিয়েছ, তুমি তা বুঝলে না।

পিতার আদেশ তুমি কোন দিন মান নি, মায়ের চোখের জলে তোমার হৃদয় গলেনি। তুমি কতবার বিপদে পড়েছ, ব্রহ্মর্ষি পিতামহ তোমাকে প্রতিবার বাঁচিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন, তাঁর কথা তুমি গ্রাহ্য করনি। ত্রিলোকপূজ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বেচ্ছায় তোমাকে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। সেখানেও তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিলে না। তাঁর অপরাধ, তিনি দেবঋষিদের উপর অযথা অত্যাচার করতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁকে পীড়ন করে নির্য্যাতন করে তাঁর পুষ্পকরথ কেড়ে নিয়ে এলে। মাতামহগণ রাক্ষস হলেও তাদের ধর্মজ্ঞান ও ন্যায়বুদ্ধি আছে, তাঁরা তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন, কোন দিন তাঁদের কথা শোননি। আজ পর্যন্ত কোন গুরুজনকে কোনদিন বিন্দুমাত্র সম্মান করনি, অথচ, নিজ গুরুজন বলে সবার কাছে বাধ্যতা চাও। ধিক্ তোমার বলবীর্য্যে! ধিক্ ধিক্ তোমার পৌরুষ! বিশ্ব জয় করে শেষে একটা নারী—হরণের পাপে একটা সামান্য মানুষের হাতে আজ মরতে চলেছ; দেবতাদের প্রতি তোমার ক্রোধের সঙ্গত কারণ ছিল; নিরপরাধ দুর্বল মরণশীল মানুষ তোমার কি অপরাধ করেছিল ?"

রাবণ উত্তেজিত হইয়া বলিল—"থাম, থাম কুম্ভকর্ণ! তোমার কাছে নীতি উপদেশ শুনবার জন্য তোমাকে ডাকি নি। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন তোমার উপদেশে কোনটাই ফিরবে না। এখন তোমার ক্রোধের সময় নয়! মানুষের হাত হতে তুমি এখন বাঁচাও। ভুল সকলেই করে—ভুল হয়ে গেছে। এখন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না। এবার বাঁচাও, তারপর তোমার উপদেশমত চলব। আর যদি তোমার প্রাণের মমতাই এত বেশী থাকে, তবে যাও ঘুমোওগে। আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। সাহায্য করতে পারো ত করো, নইলে আমার সামনে হতে দূর হয়ে যাও। উপদেশ দেওয়ার কাল এটা নয়।"

কুম্ভকর্ণ তখন কুপিত হইয়া বলিল—"কি! তুমি আমাকে কাপুরুষ বললে? আমি প্রাণের মমতায় এসব কথা তোমায় বলছি, এই তোমার বিশ্বাস? আমার জীবন আর মৃত্যুতে প্রভেদ কি? আমি ত মরেই থাকি—ছয় মাস পরে ২/৪ দিন জাগন্ত থাকায় আমার লাভ কি? মৃত্যুভয় তোমারই জন্মেছে—আমার মৃত্যু ভয় নেই। তা যদি থাকত, তোমাকে সাহস করে এত কথা শোনাতাম না। যাক —আমি যখন জেগেছি তখন যুদ্ধে যাবই এবং রামলক্ষ্মণের ছিন্নমুণ্ড এনে তোমাকে দেবই। যদি যুদ্ধে মরি, তবে তোমাকে আমার মনের কথা বলবার অবকাশ পাব না, তাই বলে নিলাম। তুমি আশ্বস্ত হও, আমি এক্ষুনি যুদ্ধে চললাম। তুমি আমাকে ভীরু বলেছ, আমি যুদ্ধে গিয়ে একাই শত্রু জয় করে আসব।"

রাবণ তখন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"সাধু, সাধু! এই তো দশাননের ভ্রাতার উপযুক্ত কথা—তবে একা যেও না ভাই—সোজা শত্রু নয় এই রামলক্ষণ।"

মহোদর বলিল—"মধ্যম, তুমি নির্বোধ—তোমার অহঙ্কার বড় বেশী। তুমি একা যুদ্ধে যেতে চাও। যারা মহারাজ দশাননকে পরাস্ত করেছে—তাদের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করবে একা? তোমার যেমন দেহ, তেমনি বুদ্ধি।"

কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিল—"থাম পাষণ্ড। থাম! ভীরু কাপুরুষের দল যত! তোরাই মহারাজকে কুবুদ্ধি দিয়ে এই বিপদ ঘটিয়েছিস। অন্ততঃ মহারাজ যা বলেছে তাতেই তোরা চাটুকারের মত সায় দিয়েছিস।

যখন দাদা সীতাহরণ করতে গেল তখন নিষেধ করতে পারিসনি? যখন রামলক্ষ্মণ খর-দূষণকে বধ করল তখন সসৈন্যে পঞ্চবটিতে গিয়ে সামান্য মানুষদুটোকে ধরে আনতে পারিসনি? রামলক্ষণকে ধরে আনতে না পেরে তাদের স্ত্রীকে একলা পেয়ে ছদ্মবেশে ছলনা করে হরণ করে আনল তোদের রাজা—তাই তোরা মস্ত বড় পৌরুষের কাজ মনে করলি। তারপর বানরসেনা সঙ্গে নিয়ে সাগর বেঁধে রামলক্ষণ লঙ্কায় এল, আর তোরা নিশ্চিন্ত হয়ে মদ্যপানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলি—সাগর বাঁধবার সময়ে বাধা দিতে পারলি না। আমি না হয় ব্রহ্মার অভিশাপে ঘুমিয়েছিলাম—তোরা কোন অভিশাপে ঘুমুচ্ছিলি। তখন আমাকে জাগাতে পারলি না? হাতে করে টেনে ওদের সেতু উড়িয়ে দিতাম।" এই বলিয়া কুম্ভকর্ণ যুদ্ধসজ্জা করিতে চলিয়া গেল।

রাবণ আশ্বস্ত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়াবহ। তাহার বিন্ধ্যগিরির মত বিরাট আকার দেখিয়া বানরগণ ভয়ে দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল। অঙ্গদ কিছুতে বানর সৈন্যের ব্যূহ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে ধরিয়া ফেলিয়া কক্ষে পুরিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল। সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া লম্ফদানে পলাইয়া আসিল। কুম্ভকর্ণ ফিরিয়া আসিলে লক্ষণ কিছুতেই তাহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না। রাম দেখিলেন যখন অমোঘ মন্ত্রঃপূত শরেও কুম্ভকর্ণের বধসাধন দুরূহ, তখন তিনি কুম্ভকর্ণের দেহটিকে খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া ফেলিলেন।

ইন্দ্রজিৎ

কুম্ভকর্ণের মৃত্যু সংবাদে রাবণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সংজ্ঞালাভের পর বহু আক্ষেপ বিলাপ করিয়া বলিল—

"ভাই, তোমাকে অকালে জাগিয়ে আমিই তোমার প্রাণ হরণ করলাম। তোমার নিকট কখনও উপদেশ গ্রহণ করি নি, ধার্মিকি ভ্রাতা বিভীষণের সকল উপদেশকে উপেক্ষা করে তাকে দূর করে দিয়েছি। তুমিও যখন গেলে তখন আর আমার আশা নেই।"

রাবণের পুত্রগণ তখন রাবণকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল,—"আপনি কেন বিলাপ করছেন, আমরা এখনও জীবিত আছি. স্বর্গবিজয়ী ইন্দ্রজিৎ আছেন, ভয় কি? আমরা আপনার শত্রু জয় করে দেব। মধ্যম কর্ত্তা ঘুমের ঘোরে যুদ্ধ করে হত হয়েছেন বলে হতাশ হবার কারণ নেই।" এই বলিয় মহোদর, মহাপার্শ্ব. নবান্তক, ত্রিশিরা অতিকায়, কুম্ভ, নিকুম্ভ, মকরাক্ষ ইত্যাদি বীরগণ যুদ্ধে যাত্রা করিল। কিন্তু মহোদর ও মহাপার্শ্ব ছাড়া সকলেই একে একে প্রাণ হারাল। এইবার ইন্দ্রজিতের পালা। ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাইয়া অলৌকিক কাণ্ড করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত মায়া যুদ্ধে রাম পক্ষের কেহই পারিয়া উঠিল না। ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রবলে সমস্ত বানরসৈন্যের চেতনা হরণ করিলেন। রামলক্ষ্মণের চেতনা লুপ্ত হইল। বানর বৈদ্য সুষেণ বিশল্য-করণী প্রয়োগে সকলের চেতনা সঞ্চার করিলেন।

ইন্দ্রজিৎ যখন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে রাম—সৈন্যের সংজ্ঞা হরণ করিয়া জয়গৌরবে রাবণের নিকট উপস্থিত হইল, তখন রাবণ ইন্দ্রজিৎকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। শোকার্ত্ত রাবণ বিজয়—সংবাদে সান্ত্বনা লাভ করিয়া লঙ্কায় মহামোহৎসবের আয়োজন করিল। কিন্তু প্রভাতে পূর্বে বানর-শিবির হইতে হর্ষধ্বনি শ্রুত হইল। শুনিয়া রাবণ একেবারে অবসন্ন হইয়া বলিল—"একি ব্যাপার; এরা মরেও মরে না! কি করে সব বেঁচে উঠল? সবই দেখছি দৈবের লীলা। কিছুতেই আর রক্ষা নেই।"

ইন্দ্রজিৎ বলিলেন—"তাত, নিশ্চিন্ত থাকুন মায়ার প্রভাবে ও অগ্নিদত্ত রথে যুদ্ধ করলে আমি অজেয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, রাম-লক্ষ্মণকে বধ করবই।" ইন্দ্রজিৎ সঙ্কল্প করিল, আগে শত্রুপক্ষকে কৌশলে দুর্বল করতে হইবে, তাহা হইলে সহজে কার্য্য শেষ হইবে।

ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণের শক্তি হরণের এক উপায় বাহির করিল। নিজ রথে এক মায়া সীতার সৃষ্টি করিয়া হনুমানের সমক্ষে তাহার শিরচ্ছেদন করিল। হনুমান স্বয়ং সীতার বলিদান মনে করিয়া বাধা দিতে গেলেন, মায়ামন্ত্রে দুর্বল হইয়া বাধা দিতে পারিলে না। তখন হনুমান কাঁদিতে কাঁদিতে এই বার্ত্তা রামের নিকট জ্ঞাপন করিলেন,—রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামের চেতনা—সঞ্চার করিয়া বিভীষণ রামকে বুঝাইয়া দিলেন যে "উহা মায়া সীতা, সত্য সীতা নয়।"

পরদিন ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে আসিবার পূর্বেই লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গোপনে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞদীক্ষিত নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করিল। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদে রাবণের ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল—তাহার হুঙ্কারে ত্রিভুবন কম্পিত হইতে লাগিল, মনে হইল যেন প্রলয় কাল আসন্ন। রাবণের খুব বড় একটা ভরসা ছিল, ইন্দ্রজিৎ অজেয়। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু-সংবাদে রাবণের সব আশা ভরসা একেবারে নির্মূল হইয়াগেল। তখন নিজের মৃত্যু কাম্য হইয়া উঠিল। মহাকবি মাইকেল ইন্দ্রজিৎ বধে রাবণের বিলাপ যে কয় পংক্তিতে ব্যক্ত করিয়াছেন এখানে তাহাই তুলিয়া দেই :—

"অগ্রসরি' রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে
ছিল আশা মেঘনাদ! মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে
সঁপি রাজ্যভার পুত্র তোমায়, করিব
মহাযাত্রা, কিন্তু, বিধি, বুঝিব কেমন
তাঁর লীলা,—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।

ছিল আশা রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে
বামে রক্ষঃকুল-লক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে,
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহু-গ্রাসে।
হা পুত্র, হা-বীরশ্রেষ্ট, চিরজয়ী রণে!
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ-বিধি রাবণের ভালে?"

রাবণের প্রতিহিংসা

ইন্দ্রজিৎ বধে রাবণের ক্রোধ এতই ভীষণ হইয়া উঠিল যে, রাবণ সকল দুঃখের মূল সীতাকে বধ করিবার জন্য চন্দ্রহাস হস্তে অশোক বনের দিকে যাত্রা করিল। রাবণ যখন সীতা-বধের জন্য খড়গ উত্তোলন করিল, তখন প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া সুশীল অমাত্য সুপার্শ্ব বাধা দিল। সুপার্শ্ব বলিল—"রাজন, সামান্য একটা নারী, যে কোন সময়ে যে কোন জল্লাদের দ্বারাই বিনষ্ট হতে পারে। এজন্য কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন? এজন্য কেন আপনার বীর বাহু কলঙ্কিত করছেন? আপনি বিশ্বজয়ী অদ্বিতীয় বীর, মানবসন্তান রাম-লক্ষ্মণকে বধ করতে না পেরে, একটা বানর—সেনাপতিকে পর্যন্ত বধ করতে না পেরে, শেষে আপনারই গৃহে বন্দিনী অসহায়া শোকে দুঃখে কাতরা একটি রমণীকে হত্যা করেছেন,—এই অপবাদ বিশ্বময় রটে যাবে। এ অকীর্ত্তি যুগে যুগে ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হবে।

আমরা জানি, লঙ্কেশ্বর আপনার সমকক্ষ বা আপনার প্রায় সমকক্ষ যারা, তাদেরই কেবল বধ সাধন করেন,—তাও কেবল যুদ্ধে। পরাজিত, সন্ধি প্রার্থী অথবা স্মরণাগত হইলে শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করেন। যারা অসহায়, দুর্বল, প্রাণভয়ে কাতর এমন কাউকে লঙ্কেশ্বর কখনো

হত্যা করে তাঁর মন্ত্রপূত শিবদত্ত মহাখড়্গের অমর্য্যাদা করেছেন, এমন কথাত কখনো শুনিনি, কখনো কল্পনাও করতে পারি না।

আপনি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ব্রহ্মর্ষির বংশে আপনার জন্ম, উগ্রতপা ঋষির সন্তান আপনি, দেবলোকজয়ী আপনি ত্রিভুবনের অদ্বিতীয় বীর আপনি। আপনি কিনা শোকে ও ক্রোধে অন্ধ হয়ে স্ত্রীহত্যা করবেন? রাবণ সুপার্শ্বের হিতবাক্য মন দিয়া শুনিল। শেষে ঝড়ের মত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া খড়্গ কোষবদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

রাবণ দেখিল—মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষ দুই তিন জন মাত্র বীর অবশিষ্ট আছে। এই তিন জন বীরকে সঙ্গে লইয়া রাবণ যুদ্ধযাত্রা করিল। মহোদর ও বিরূপাক্ষ, সুগ্রীবের, ও মহাপার্শ্ব অঙ্গদের হাতে প্রাণ হারাইল। তখন রাবণ একাই যুদ্ধ করিতে লাগিল।

লক্ষ্মণ মেঘনাদকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করিয়াছে, সর্বাগ্রে লক্ষ্মণের বধ সাধনই তাই রাবণের সঙ্কল্প। লক্ষ্মণ রাবণের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন রাবণ তাহার অমোঘ শক্তিশেল প্রয়োগ করিল। সেই শক্তিশেল লক্ষ্মণের বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইয়া গেল, লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। বানর সেনাপতিগণ হায় হায় করিতে লাগিল। তাহারা লক্ষ্মণের চারিপাশে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। রাম ছুটিয়া আসিলেন, দেখিলেন লক্ষ্মণ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে এবং কাতরভাবে আর্তনাদ করিতেছে। বহু কষ্টে আত্মসংম্বরণ করিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণের মাথা কোলে তুলিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন রামচন্দ্রের সে ভাবে বসিয়া শোক করিবার অবসর নাই। রাবণ হুঙ্কার করিয়া যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে,—একা হনুমান রাবণকে প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছে।

লক্ষ্মণকে হারাইয়া রামের আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। তবু ক্ষাত্রধর্ম পালনের জন্য রামকে যুদ্ধে যাইতে হইল। রাবণকে দেখিয়া রামের ক্রোধ প্রলয়াগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল। রাম ধৈর্য্য অবলম্বন

করিয়া কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিলেন ;—কিন্তু ভ্রাতৃ শোকে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। রাবণ রামের দারুন অবস্থা দেখিয়া কতকটা কৃপা করিয়াই যেন অস্ত্রসংম্বরন করিল। "অদ্য এক ভ্রাতাকে বধ করিলাম,—কল্য অন্য ভ্রাতাকে বধ করিব।" এই সঙ্কল্প পোষণ করিয়া রাবণ বিশ্রামার্থ লঙ্কায় ফিরিয়া আসিল।

রাবণবধ

লক্ষ্মণ বধ করিয়া রাবণ লঙ্কায় ফিরিল, কিন্তু কোন উল্লাস বা সমারোহ নাই। রাবণ বড়ই বিষণ্ণ, বড়ই চিন্তাকুল। একবার ভাবিল ইন্দ্রজিৎ বধের প্রতিহিংসা লওয়া হইল। পিতার কর্ত্তব্য সাধন করা হইল। রাম যেরূপ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে কল্য সহজে বধ করা যাইবে; কিন্তু তাহাতেই বা লাভ কি হইবে? পুত্র পৌত্র সব হারাইয়া বিজয়ী হইয়া লাভ কি হ`বে? এখন সীতা যদি বশবর্ত্তিনীই হয়, তাহাতেই বা লাভ কি? রামচন্দ্র মরিয়াও বিজরী হইবে। হায়! এই লক্ষ্মণ—বধ কেন পূর্বেই করা হইল না!

আবার লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিবে কিনা তাহাই বা কে বলিল? রামচন্দ্র কল্য ভ্রাতৃবধের প্রতিহিংসার জন্য হয়ত দ্বিগুণ বলেই যুদ্ধ করিবে, হয়ত দেবতারা কল্য রামচন্দ্রকে সহায়তা করিবে। আজ রামচন্দ্রকে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই, আজ সে একেবারে ভ্রাতৃশোকে অবসন্ন ছিল, কাল হয়ত তাহার নিজেরই শেষ দিন। তাহাই যদি হয় তাহাতেই বা দুঃখ কি? যাহাদের জন্য জীবন-ধারণ তাহাদের সকলকে হারাইয়া বাঁচিয়াই বা কি লাভ?

রাবণ মন্দোদরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল—"মন্দোদরী, তোমার কথা কোন দিন শুনিনি,—তোমার নিষেধ না শুনে কাল-সাপিনীকে ঘরে এনেছিলাম, তার ফল পেলাম। সব গেল, সব দর্প চূর্ণ হল। তোমার পুত্রহন্তাকে আজ বধ করে এসেছি, কিন্তু তবুত শান্তি পাচ্ছি না। আমার যেন মনে হচ্ছে, কাল আমার শেষ দিন,

চারদিকে দুর্লক্ষণ দেখছি। কাল যদি রামকে বধ করেও আসি, তবু এই শূণ্য লঙ্কায় আর কি করব? আমার মনে হচ্ছে. রাম লক্ষ্মণে বধের প্রতিহিংসা কাল নেবেই নেবে। কাজেই হয়ত তোমার সাথে এই শেষ দেখা। এই পাষণ্ড তোমাকে কোন দিন শান্তি দেয় নি। তোমাকে মা বলে ডাকবার কেউ থাকল না। আমিই সবার মৃত্যুর কারণ। পিতা হয়ে আমি সকলকে বধ করেছি। নিজের কামনার চরিতার্থতার জন্য, আত্মভিমানের পরিতৃপ্তির জন্য, স্বার্থের অনলে সকলকে আহুতি দিয়েছি। তোমার কাছে ক্ষমা চাইতেও আজ আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। ভাবতেও পারি নি সামান্য মানুষের এত ক্ষমতা থাকতে পারে। না, সীতা কালসাপিনী নয়, সূর্পনখাই কালসাপিনী। দুই ভাই বোনে মিলে সব শেষ করলাম।"

এই বলিয়া রাবণ পাগলের মত বজ্রধ্বনিতে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। মন্দোদরী বুঝিল,—তাহার বিধবা হইতে আর বিলম্ব নাই। আর ভাবিল—আজ সেই হিমাদ্রি প্রমাণ ধৈর্য্য কোথায় গেল? যে ধৈর্য্য খরদুষণ কুম্ভকর্ণের মত ভ্রাতা, অতিকায়, মকরাক্ষ, ইন্দ্রজিতের মত পুত্রের বিয়োগেও বিচলিত হয় নাই—আজ সে ধৈর্য্য কোথায় গেল? এমন অঘটন—ঘটন আসন্নকাল ছাড়া ঘটিতে পারে না।

* * *

রাত্রিকালে সুষেণ ও জাম্ববানের উপদেশে হনুমান গন্ধমাদন পর্বতের অংশ—বিশেষ লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে কয়েকটি ওষধি ছিল—সুষেণ সেই ওষধি হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লক্ষ্মণের ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিল। তাহার ফলে লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিল।

পরদিন প্রভাতে রাবণ অ বার সমরে আসিল। আজ রাবণের রাক্ষস-জীবনের শেষ দিন। রাবণ-বধের সহায়তার জন্য ইন্দ্র মাতলির সারথ্যে তাঁহার বিমান পাঠাইয়া দিলেন। অগস্ত্য উপস্থিত হইয়া আদিত্যহৃদয় মন্ত্র শিক্ষা দিয়া গেলেন। এই মন্ত্র জপ করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলে শত্রুবধ অনিবার্য্য। রাম আজ ইন্দ্রের রথে চড়িয়া রাবণের সম্মুখীন হইলেন। ইন্দ্রের বিমান দেখিয়া রাবণ বুঝিল,

দেবতারা সুযোগ পাইয়া আজ প্রতি হিংসা লইবে। আজ রাম রাবণের মধ্যে প্রথম বাক্যালাপ হইল। রাম রাবণকে সীতা হরণের জন্য তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"পাষণ্ড আজ তোর নিস্তার নেই।" রাবণ উত্তর করিল—"তা জানি।"

সারাদিন ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ। রাবণ ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। তখন রামচন্দ্র অগস্ত্য—দত্ত অস্ত্রে তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য, ছিন্ন শির আবার যথাস্থলে সন্নিবেষ্টি হইল। রামচন্দ্র একশত বার রাবণের মুণ্ডুচ্ছেদ করিলেন একশতবার মুণ্ড স্কন্ধে সংযোজিত হইল। তখন রামচন্দ্র ক্লান্ত, হতাশ ও অবসন্ন হইয়া ঘন ঘন আদিত্য হৃদয় জপ করিতে লাগিলেন।

মাতলি তখন বলিলেন—"দাশরথি, আপনি সঙ্কটকালে সব ভুলে গেলেন, ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করুন। মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত সমাগত, আর দেরী করিবেন না রাম অগস্ত্য-দত্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিবামাত্র অস্ত্র রাবনের বক্ষ ভেদ করিয়া প্রাণ হরণ করিয়া পুনরায় তূণীর ফিরিয়া আসিল। রাবণ ভীষণ শব্দে ভূতলে পতিত হইল।

রাবণের পতন হইবামাত্র বিভীষণ ছুটিয়া আসিলেন। তিনি রাবণের বক্ষে পড়িয়া শোক করিতে লাগিলেন। বিভীষণ আক্ষেপ করিতে করিতে রামচন্দ্রকে যাহা বলিলেন—তাহা হইতে রাবণে চরিত্রের এটা দিকের আভাস পাওয়া যায়—

"এই মহাবীর যাচকদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করিয়াছেন,—নানারূপ ভোগ্য বস্তু উপভোগ, ভৃত্যগণকে পোষণ, মিত্রগণের শ্রীবৃদ্ধি ও শত্রুগণের নিপাত সাধন করিয়াছেন। ইনি বেদ বেদান্ত পারগ, মহাতপা এবং অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা। ইহার শাস্ত্র সম্মত অন্ত্যেষ্ঠি কার্য্য করিতে চাই।" [মূল রামায়ণের অনুবাদ]

রাক্ষসকুলপতি মাতামহ মাল্যবান রাবণপ্রস্থীগণ ও অন্যান্য রাক্ষস বধূদের সঙ্গে লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তারপর একটা হাহাকারময় শোকপর্ব! বিরাট পুরুষের পতনে শোকসমারোহও

হইল বিরাট। মহাসমারোহে রাবণ, তাহার পুত্র-পৌত্র, মিত্রামাত্য গণের শাস্ত্র সম্মত অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

উপসংহার

ত্রিভুবনের মহাবৈরীর পতন হইল। দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষ-বিদ্যাধর-সিদ্ধ-অপ্সর-কিন্নর-নাগ-নর-বানর, মর্ত্য রসাতলে যে যেখানে ছিল. এই শুভ-বার্ত্তা শুনিয়া সে-ই হর্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনির সহিত মহামহোৎসব হইতে লাগিল। এতবড় পাষণ্ড এই রাবণ, মনে হয় ইহার পক্ষে বলিবার কিছু নাই। তবু এই পাষণ্ডকে ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া বর দিয়েছিলেন,—পিতামহ পুলস্ত্য স্নেহবশে দুইবার বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন,—কার্ত্তবীর্য্য ও বালী ইহার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন—মহাদেব অনুগ্রহ করিয়া অমোঘ খড়গ উপহার দিয়াছিলেন,—সমস্ত রক্ষকুল ইহার জন্য বিনা বাক্যে জীবন সমর্পণ করিল এবং স্বয়ং বিষ্ণু বহু যুগ ধরিয়া ইহাকে সহ্য করিয়া ছিলেন।

নিশ্চয় ইহার পাপের ভরা পূর্ণ হইতে বাকী ছিল,—নিশ্চয়ই ইহার হিমাদ্রি প্রমাণ পাপের অনেকাংশই পূর্ব সঞ্চিত পুণ্য ও তপের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছিল। আমাদের কবি নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন—

রামের ছায়ায় যদি না হ'ত চিত্রিত
হত কি রাবণ বিশ্বে এতই ঘৃণিত ?

ঋষি বিশ্রবা অতিসামান্য কারণে কৃপাপ্রর্থিনী সরলা, অবলা, ধর্মানুরাগী কৈকসীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—"তোমার গর্ভে ভীষণাকার রাক্ষস জন্মিবে।" ঋষির ক্রোধে রাবণের জন্ম। রাবণ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শুনিল,—পিতার অভিশাপেই সে দারুনপ্রকৃতি হইয়া জন্মিয়াছে, তখন পিতার প্রতি তাহার কোন শ্রদ্ধা থাকিল না, থাকিতেও পারে না। শুধু পিতার প্রতি কেন সমগ্র তপোদৃপ্ত ঋষি সমাজের প্রতিই তাহার মজ্জাগত বিদ্বেষ ও রোষ জন্মিয়া গেল। অগ্রজ

কুবের ছিল পিতার অনুগত পুত্র। তাহার প্রতিও তাহার ভক্তি জন্মিল না। কৈকসী ছিল রাক্ষস কন্যা, কিন্তু নিজে রাক্ষসী ছিল না। রাক্ষসী প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে প্রছন্ন ছিল। নতুবা ঋষির অভিশাপ ফলবান হইবার অনুকূল ক্ষেত্রই পাইত না। সেই প্রবৃত্তি যদি রাবণের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিয়া থাকে,—তবে রাবণ সে জন্য দায়ী নয়।

রাক্ষস প্রবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও রাবণ ঋষির আশ্রমেই প্রতিপালিত এবং আশ্রমধর্মে দীক্ষিত। রাবণ সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল বেদান্তের গূঢ়মর্ম বুঝিয়াছিল। চতুর্বেদ তাহার কণ্ঠস্থ ছিল,—যখন সে দণ্ডীর বেশে সীতাহরণ করিতে গিয়াছিল, তখন বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সীতার আতিথ্য প্রার্থনা করিয়াছিল। রাজনীতিতে রাবণের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। শাস্ত্রনীতি লইয়া রাবণ অনেক সময় বিভীষণ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণের সহিত গভীরভাবে আলোচনা করিত। রাবণ বহুবিধ যাগযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিল,—লঙ্কাতেও তাহার পৃথক যজ্ঞশালা ছিল।

তারপর তপস্যা। এমন দারুন উগ্র তপস্যা দেব, দানব, মানব কেহই করে নাই—একথা ব্রহ্মা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তপস্যার পরিমাণ বিচার করিলে বিশ্বজয়ের শক্তিকে বরস্বরূপ লাভ করা তাহার পক্ষে অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। রাবণ দেবতা-দিগকে জ্ঞাতি-বৈরী-স্বরূপ মনে করিত। দেবতারা কুম্ভকর্ণের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাতে রাবণের মনে যে দেববিদ্বেষ জন্মিবে তাহাতে বৈচিত্র্য কিছু নেই।

কুবেরের প্রতি রাবণের যে শ্রদ্ধা ছিল না তাহা নয়।

রাবণের মাতামহ যখন কুবেরের নিকট হইতে লঙ্কাপুরী কাড়িয়া লইবার উপদেশ দিল,—তখন রাবণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কুব্যবহার করিতে রাজী হয় নাই,—বলিয়াছিল—"জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্য হরণ করা অন্যায়,—তাহা না করিয়া নতুন রাজ্য গঠন করিব।" রাক্ষসদের পীড়াপীড়িতে সে অগ্রজের নিকট লঙ্কা চাহিয়াই লইয়াছিল। পরে

দেবতাদের সহিত বিবাদের সময় যখন কুবের রাবণকে শাসন করিয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার ভয় দেখাইয় ছিলেন—তখন রাবণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল। কুবের একজন দেবতা,—উত্তর দিকপাল। কুবেরের সহিত বিবাদ দেবতাদের সহিত বিবাদের অঙ্গীভূত।

রাবণ মহাদেবের উপাসক ছিল, স্তব-স্তুতিতে শিবকে বশীভূত করিয়া অমোঘ অস্ত্র ও বর লাভ করিয়াছিল।

তাহার পর দিগ্বিজয়, সকল রাজাই পরাক্রমশালী হইলে দিগ্বিজয় বহির্গত হয়—ইহা রাজধর্মের অন্তর্গত। রাবণের দিগ্বিজয় তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে।

রাবণ স্বজন প্রতিপালক ছিল,—পাতাল হইতে মাতুল বংশের সকল রাক্ষসকে লঙ্কায় আনিয়া প্রতিপালন করিত। আপন বুদ্ধিতেই সকল সময়ে কাজ করিত না, —সুমালী, মাল্যবান, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বিভীষণ ইত্যাদিকে প্রায় সকল সময়েই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিত।

রাবণ ভ্রাতৃ বৎসলও ছিল—কুম্ভকর্ণকে দেবগণ প্রবঞ্চিত করিয়াছে বলিয়া তাহার ক্ষোভের অবধি ছিল না। সূর্পনখার স্বামীকে অজ্ঞাতসারে বধ করিয়াছিল—সে জন্য তাহার বড়ই অনুতাপ হইয়াছিল। তাই দুঃখিনী ভগিনী যখন রাবণকে প্রকৃত কথা গোপন করিয়া নিজের লাঞ্ছনার কথা জানাইল—তখন রাবণ প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। যে সূর্পনখার বৈধব্যের কারণ রাবণ নিজে—সেই সূর্পনখার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লইতে জীবন পর্যন্ত পণ করা কর্তব্য বলিয়া রাবণ মনে করিয়াছিল। ভগিনীর প্রতি অত্যধিক স্নেহই রাবণের পতনের কারণ হইল।

রাবণ বিভীষণকেও নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করিত—নতুবা বিভীষণ সীতা হরণের পূর্ব পর্যন্ত কিছুতেই রাবণের সভায় থাকিতে পারিতেন না। রাবণ ক্রমাগত মহাপাপ করা সত্ত্বেও ধর্মনিষ্ঠ বিভীষণ যে তাহাকে ত্যাগ করেন নাই—তাহার বোধ হয় প্রধান কারণ, খরদূষণ রাবণের

মাসতুতো ভাই—এবং কুম্ভীনসী মাসতুতো বোন। রাবণ ইহাদিগকে সহোদর সহোদরার মতই ভালবাসিত।

ঋষিগণের অনুরোধে রাম-লক্ষণ দণ্ডকারণ্যের রাক্ষস বধ করিতে-ছিলেন যৌবনারম্ভে ইহারা ও সুবাহুর সহিত অনেক রাক্ষস ধ্বংস করিয়াছিলেন। পূর্ব হতেই রামচন্দ্র রাক্ষসের বৈরী—সীতাহরণের পূর্ব হতেই তাঁহার সহিত রাবণের জাতীয় বৈরিতা। সীতাহরণের পর রাবণ আপনার ভুল বুঝিয়াছিল—কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। আত্মমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বাধ্য হইয়া রাবণের যুদ্ধ করিতে হইয়া-ছিল। রাবণ চরিত্রে কিছুমাত্র ভীরুতা বা কাপুরুষতা থাকিলে রাবণ সীতাকে প্রত্যর্পণ করিত।

রাবণ রজোগুণের প্রতিমূর্তি। রজোগুণের সহিত যে সকল গুণদোষ বিজড়িত—রাবণের তাহার সবই ছিল। তাই রাবণ চরিত্রে ছিল—বিপুল বিক্রম, তেজস্বিতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, অগাধ আত্মবিশ্বাস, অকুণ্ঠিত সাহস, শৌর্য্য, বীর্য্য ও স্থৈর্য্য, অপূর্ব শোক—বিজয়ের ক্ষমতা—বিন্ধ্যপ্রমাণ দম্ভ—অতৃপ্ত জয়তৃষ্ণা। এই সঙ্গেই তাহার জীবনে ছিল ঐশ্বর্য্যের সমারোহ, সর্ব-বিষয়ে ঘটা ও আড়ম্বর—নিত্য মহোৎসব ও দানযজ্ঞ, সংগ্রামে পৈশাচিক উল্লাস ও বিশ্রামে আকণ্ঠ ভোগমগ্নতা।

মহাকবি রাবণ চরিত্রে দেখাইয়াছেন—উগ্র তপস্যা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বিপুলবিক্রম, অনন্য-সাধারণ দেবানুগ্রহ, পবিত্রজন্ম, গুণগৌরব—অটল ধৈর্য্য। এইগুলির সহিত নৈতিক মহত্ত্বের কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই।

নৈতিক মহত্ত্বের সাধনা সম্পূর্ণ পৃথক সাধনা। দুশ্চর তপস্যা ও দারুণ আত্ম-নিগ্রহের সাধনার অপব্যবহার হইতে পারে—অগাধ পাণ্ডিত্যকে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফল করিয়া তোলা যাইতে পারে—বিপুল বিক্রমকে পরপীড়নে নিয়োগ করা যাইতে পারে—মহাজ্ঞানী মহা-তপস্বীর পিতৃত্বে জগতের প্রধান বৈরীর জন্ম হইতে পারে—তপোবনে প্রতিপালিত হইয়া ঋষিপুত্রও ন্যায়ধর্মকে পদদলিত করিতে পারে—

তপ, জ্ঞান, তেজ ইত্যাদি সব যেমন নৈতিক মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করিতে পারে—পাপকেও তেমনি প্রবলতর করিয়া তুলিতে পারে। রাবণ-চরিত্রে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে নৈতিক মাহাত্ম্য যাহার আদর্শ—সেই মহাপুরুষ আবার ঐ রাবণেরই সহোদর হইয়াই জন্মিতে পারে।

রাবণের নৈতিক আদর্শ যাহাই হউক—তাহার তেজ, তপ ও পুণ্য-বল এত বেশী ছিল যে তাহাকে শাসন করিতে গিয়া স্বয়ং ধর্মই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন—বিধাতার চিরন্তন নিয়মানুসারে তাহার দণ্ড ঘটে নাই, তাহাকে চরম পাপ অনুষ্ঠান করিবার জন্য প্ররোচিত করিতে হইয়াছে স্বয়ং ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে—কেন এত কাণ্ড? পাপের দণ্ড অতি সহজ। কিন্তু পাপের পশ্চাতে যদি বিশাল তপ সহায়তা করিতে থাকে—তবে বিধাতাকেও দণ্ডের জন্য বিশিষ্ট আয়োজন করিতে হয়।

রাম-রাবণের মধ্যে যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা ভীষণতর যুদ্ধ হইয়াছিল, রাবণে তপ ও পাপের মধ্যে। রাবণের তপের শক্তি বর লাভ করিয়াই তো লুপ্ত হয় নাই। বরটা তো পুরস্কার মাত্র। রাবণের তপঃ শক্তি তাহার দেহ, মন ও আত্মার অঙ্গীভূত হইয়া তাহার জীবনের চিরসঙ্গী হইয়া বিরাজ করিতেছিল। এই তপের সহিত তাহার অনুষ্ঠিত পাপের সংগ্রামই তাহার জীবনযাত্রা।

রাবণের পাপ যেদিন তাহার তপকে পরাজিত করিল, সেই দিনই তাহার কাল পূর্ণ হইল। এই অমৃত ক্ষণটির জন্যই অপেক্ষা করিতে ছিলেন, ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে, ইন্দ্র অমরাবতীতে, কুবের অলকাপুরীতে, স্বয়ং বিষ্ণু রামরূপে সিন্ধুতীরে বানরের কোলাহলের মধ্যে, স্বয়ং লক্ষ্মী রাবণের অশোক বনে বন্দিদশায়, ঋষিগণ আপন আপন আশ্রমে হোমকুণ্ডের ধারে দারুণ উৎকণ্ঠায় আর স্বয়ং ধর্ম প্রতীক্ষা করিতেছিলেন রাবণানুজ বিভীষণের চিত্ত-শতদলে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—